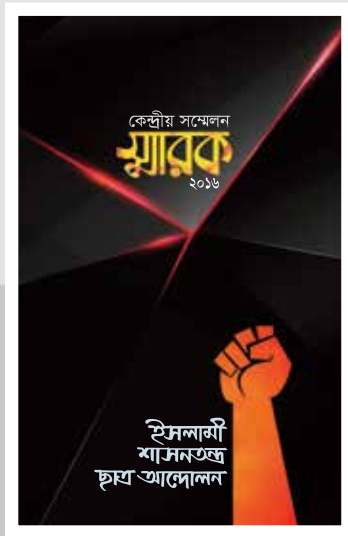


কেন্দ্রীয় সম্মেলন
স্মারক
২০১৬


ইসলামী
শাসনতন্ত্র
ছাত্র আন্দোলন



কেন্দ্রীয় সম্মেলন
স্মারক
২০১৬



ইসলামী
শাসনতন্ত্র
ছাত্র আন্দোলন



সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক

জি.এম. রুহুল আমীন

নির্বাহী সম্পাদক

নূরুল করীম আকরাম

প্রকাশকাল

১ জানুয়ারি ২০১৬

২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭

১৮ পৌষ ১৪২২

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা

ইবরাহীম কোব্বাদী

আবিষ্কার, ঢাকা

শুভেচ্ছা বিনিময়

আশি টাকা মাত্র

প্রকাশনায়

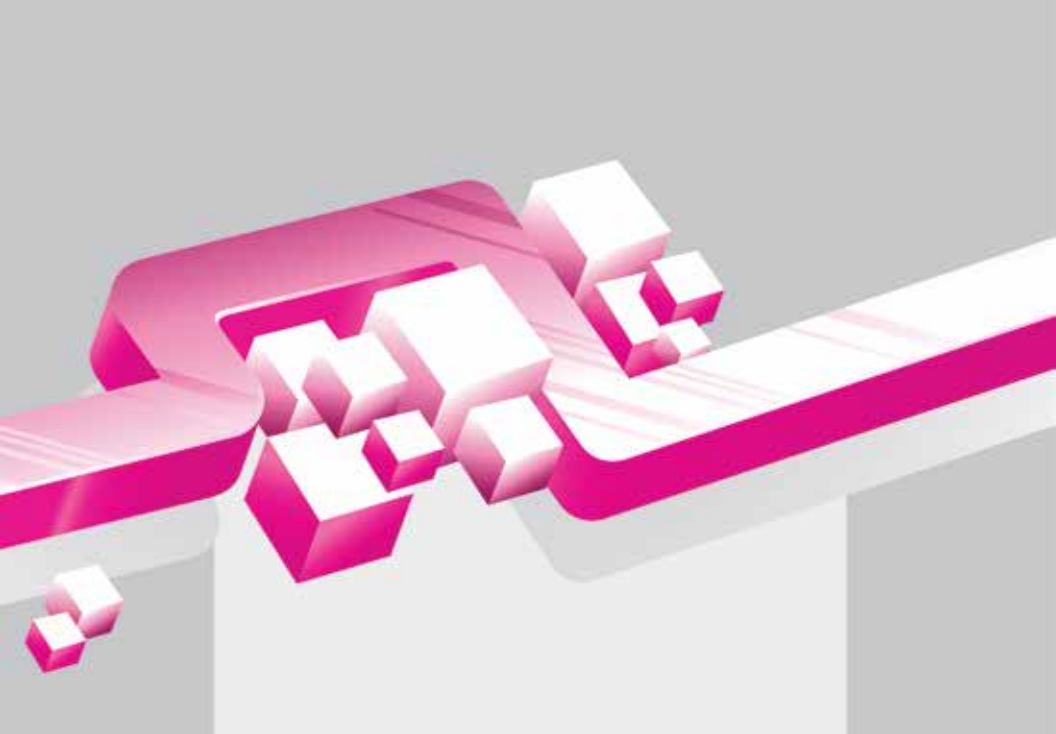
কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

৫৫/বি পুরানা পল্টন [৩য় তলা]

ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৫৭১৩১

Web : www.iscabd.org



এবারের আয়োজন

বাণী

সম্পাদকীয়

উদ্বোধনী বক্তব্য

বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব থেকে বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গভঙ্গ থেকে ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতা (১৯০৫-১৯৪৭)

১৯৪৭-এর দেশ বিভাজন থেকে ১৯৫৪-এর নির্বাচন

পাকিস্তান রাষ্ট্রে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন থেকে ৭০-এর নির্বাচন

স্বাধীনতায়ুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৭৫)

বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৭৫-২০১৫)

বাংলাদেশের সংবিধান : একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সরকার কাঠামো

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের তালিকা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর

মুহতারাম আমীর

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম

[পীর সাহেব চরমোনাই]-এর



নাহমাদুহ ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আন্মা বা'দ ।

ইসলামের এই সংকটময় মুহূর্তে ইসলামী আদর্শবাহী ছাত্র কাফেলা ইশা ছাত্র আন্দোলন কর্তৃক ইতিহাসভিত্তিক কেন্দ্রীয় সম্মেলন স্মারক ২০১৬ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি ।

গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সহীহ ধারার ইসলামী রাজনীতির আপোষহীন সিপাহসালার, কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম রহ.-কে । যিনি শত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে আল্লাহর বান্দাদের সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ দেখিয়ে মাওলার পরম সান্নিধ্যে চলে গেছেন । আল্লাহ তা'য়ালার তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন ।

আল্লাহর কুতুব মরহুম সৈয়দ ফজলুল করীম রহ. যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৯১ সালের ২৩ আগস্ট ইশা ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ আমরা তার বাস্তবায়ন দেখছি । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যারাই ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছে, প্রত্যেকেই ছাত্রদেরকে নিজেদের ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে । বই-খাতা-কলমের পরিবর্তে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে । তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে । সর্বোপরি জাতির ভবিষ্যৎ কর্পধার ছাত্র সমাজের এই করুণ অবস্থা দেখেই মূলত তিনি ইশা ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন । আল্লাহর কুতুবের সেই উদ্যাগের কারণেই ছাত্র রাজনীতির এই চরম অবক্ষয়ের মাঝেও ইশা ছাত্র আন্দোলন ছাত্র রাজনীতিতে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে ।

আজ সারা বিশ্বে আবু জাহেলের অনুসারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধীনকে মিটিয়ে দেওয়ার যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে । মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতেও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কুচক্রীমহল সমানভাবে সক্রিয় । ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের চক্রান্তের মাধ্যমে ইহসানের পথ রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে । এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশ, জাতি ও ঈমান বাঁচাতে জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের কাণ্ডারী ছাত্র সমাজকেই মূখ্য ভূমিকা পালন করবে হবে ।

আমরা বিশ্বাস করি আগামী দিনে দেশ, জাতি ও মানবতার সুরক্ষা এবং ইসলামের বিজয় পতাকা উভয়ই মেধাবী ছাত্রদের এই কাফেলা গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ । মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামী আন্দোলনের পথে জানমাল ও সময়ের সর্বোচ্চ কুরবানির দৃষ্টান্ত স্থাপনের তাওফিক দিন । আমীন॥

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর
মুহতারাম মহাসচিব

অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমাদ -এর



নাহমাদুল্ ওয়ানাশকুরুহ ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিলিহি কারীম, আম্মা বা'দ।

ইশা ছাত্র আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন'১৬ উপলক্ষ্যে 'ইতিহাসভিত্তিক স্মারক' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ইশা ছাত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আমীরুল মুজাহিদীন হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই রহ.-কে। যিনি প্রায় নয় বছর পূর্বে আমাদের মাঝ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁর রুহের মাগফিরাত এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকামের জন্য দোয়া করছি।

আজ ইসলাম, দেশ, জাতি ও মানবতা এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একেরপর এক ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে সারাবিশ্বের ঈমানদার মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত জরুরী। আর এ আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে অতীতের মত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সকল আন্দোলন সংগ্রামে তরুণ ছাত্র সমাজের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

তাই, কেন্দ্রীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে দেশের স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল ধারার ছাত্রসমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান দেশ, জাতি, ঈমান ও ইসলামের এই ক্রান্তিলগ্নে আপনারা অতীতের মত সত্য, ন্যায় ও ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুন। জাতি আজ আপনারদের কাছ থেকে সেটাই প্রত্যাশা করছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমীন॥

-gynvα§v` BDbyQ Avngv`



সম্পাদকীয়

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ।

চারদিকে আজ অন্যায় অবিচার জ্বলুম নির্যাতন আর আধুনিক জাহেলিয়াতের কবলে নিমজ্জিত পুরো জাতি। ন্যায় অন্যায়ের তোয়াক্কা না করে ব্যক্তি স্বত্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে একশ্রেণি সদা তৎপর। রাষ্ট্র পরিচালনার মূল মসনদে বসে যারা বারবার অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে, তাদেরকেই আবার ক্ষমতার মসনদে আরোহণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তারা। ভিনদেশী প্রভুদের খুশি করতে দেশের ক্ষতি করেও এসকল নায়কেরা কুষ্ঠাবোধ করছেন। যখন দুর্নীতির আখড়া গড়ে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে অর্থনীতির ভিত ভেঙ্গে দেয় তখনও তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে তারা দ্বিধাবিভক্ত। পরিকল্পিতভাবে যারা দেশের হিন্দু-মুসলমানদের মাঝে দাঙ্গা লাগাতে তৎপর, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুরো ব্যর্থতার পরিচয় বহণ করছে। একের পর এক বিদেশী নাগরিকদের উপর হামলা করে দেশে জঙ্গীবাদের ধোঁয়াশা তুলছে। সর্বোপরি ইসলাম, দেশ, মানবতাকে নিয়ে একশ্রেণি গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসের কবলে আজ জিম্মি হয়ে পড়ছে। যার দরুণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলো বারংবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে গুটি কয়েক এসব সন্ত্রাসের কারণে মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষার পরিবেশ বারবার বিঘ্নিত হচ্ছে। ছাত্র সমাজ তার মূল দায়িত্ব থেকে আজ বহুদূরে অবস্থান করছে। ১৯৯১ সালের ২৩ আগস্ট পীর সাহেব চরমোনাই রহ. ছাত্রদের নৈতিক আদর্শে পুরোপুরি ইসলামের প্রতিফলন ঘটানোর মানসে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ দুই যুগ পেরিয়ে ছাত্র আন্দোলনের কার্যক্রম ত্রিধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ পরিচালিত হচ্ছে।

জাহেলিয়াতের অবসান ঘটিয়ে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠায় জানমাল, সময়ের কোরবানী করে একমাত্র আল্লাহর সম্ভৃতি লাভের প্রত্যাশায় আমরা নিয়োজিত রয়েছি পুরোপুরি দীনের রাহে।

১ জানুয়ারি'১৬ কেন্দ্রীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে নবাগত ছাত্রবন্ধুদের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান থাকবে, দেশের তথাকথিত জাগতিক রাজনৈতিক পথকে পরিহার করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের পতাকাতলে নিজেকে शामिल করুন।

আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি দীর্ঘ পরিশ্রমের পরে আমাদেরকে ১ জানুয়ারি'১৬ কেন্দ্রীয় সম্মেলনে “ইতিহাসভিত্তিক স্মারক” প্রকাশ করার তৌফিক দান করেছেন। কেন্দ্রীয় সম্মেলনের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্মারক প্রকাশ করতে এবং যারা আমাদেরকে স্মারকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি স্মারকে অনিচ্ছকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তা'য়ালার আমাদেরকে তাঁর দীনের রাহে কবুল করুন। আমীন ॥

-wR.Gg. iæûj Avgxb



ইতিহাসভিত্তিক স্মারক



দলীয় স্বগীত

আমরা নবীন আমরা তরুণ আমরা নওজোয়ান
উড়াবো এই ধরার বুকে তাওহিদী নিশান

আমরা কাসিম আমরা ওমর আমরা যে খালিদ
আঘাত হেনে ভাঙ্গবো মোরা এই সমাজের নীদ
লড়বো মোরা খোদার পথে লড়বো আমরা
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

মজলুমানের আর্তনাদে ভারি যে আকাশ
কাঁদছে ওরা অকাতরে করছে হা-হুতাশ
চিরতরে জালিম শাহীর আনবো যে পতন
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

আল্লাহ হলেন মোদের সাথী নেইকো কোন ভয়
তাঁরই মদদ পুঁজি করে আনবো যে বিজয়
তারুণ্যেরই দীপ্ত শিখা দূরন্ত মিশন
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

আয়রে দামাল আয়রে কিশোর আয়রে ছুটে আয়
বজ্রমুঠে নিশান হাতে বিপ্লবী গান গাই
শপথ নেব খোদার পথে বিলাতে জীবন
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

কথা ও সুর

আইনুদ্দীন আল আজাদ রহ.

সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের
কেন্দ্রীয় সম্মেলন'১৬-এ
কেন্দ্রীয় সভাপতি

নূরুল ইসলাম আল-আমীন প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তব্য

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিলিল কারীম। আম্মা বা'দ।

তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলছে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে জালিম অধ্যুষিত এই এলাকা থেকে মুক্তি দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে বন্ধু ও সাহায্যকারী পাঠাও (সুরা নিসা : ৭৫)।

মেধাবী ছাত্রদের প্রিয় সংগঠন, শান্তিকামী-মুক্তিকামী শিক্ষার্থী বন্ধুদের একান্ত ঠিকানা, এশীয়া মহাদেশের সহীহ ধারার সর্ববৃহৎ ইসলামী ছাত্র সংগঠন, বিপ্লব প্রত্যাশী শহিদীকাফেলা ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কর্তৃক আয়োজিত কাজী বশির মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় সম্মেলন'১৬ -এর প্রধান অতিথি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীর, এদেশের গরীব-দুঃখী মানুষের একান্ত আপনজন, পথহারা মানুষের আস্থাভাজন রাহবার, দেশের মাটি ও মানবতার স্বার্থ রক্ষার্থে টিপাইমুখ অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চে নেতৃত্বদানকারী, মুসলিম জনতার ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা আমীরুল মুজাহিদ্দীন আলহাজ হযরত মাওলানা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই)। হযরত ওলামায়ে কেরাম, বরণ্য শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট কলামিস্ট, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, জাতির বিবেক কলমসৈনিক সাংবাদিক বন্ধুগণ, নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসনের ভাইয়েরা, সম্মানীত সুধীমণ্ডলী, উপস্থিত সারাদেশ থেকে আগত ইসলাম, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ এবং জাহেলি সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে অঙ্গিকারবদ্ধ সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার। সকলকে জানাই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও বিপ্লবী অভিনন্দন।

আলহামদুলিল্লাহ! শত ব্যস্ততা, প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতাকেউপেক্ষা করে আজকের সম্মেলনের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। মহান আল্লাহর অপরিসীম দয়া ও অশেষ মেহেরবানীর জন্য প্রথমেই তাঁর আলীশান দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

দরুদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি, যিনি উম্মতের সামনে দ্বীন বিজয়ের পথ ও পদ্ধতি রেখে গেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামায়াত হযরত সাহাবায়ে কেরামের প্রতি, যারা দ্বীন বিজয়ের আন্দোলনে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, দ্বীন বিজয়ের আন্দোলনকেই নিজেদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সে সব নিবেদিত প্রাণ মহামানবদের প্রতি, যারা দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের সাধনা হিসেবে গণ্য করেছেন।

আজকের এ সম্মেলন থেকে দীপ্ত কর্ত্তে ঘোষণা করছি- হযরত সাহাবায়ে কেরাম, তাব্বঈন, তাব-তাব্বঈন, সলফে সালাহীন ও বুজুর্গানে দ্বীনের রেখে যাওয়া পথকেই আমরা আমাদের জীবন চলার পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছি।

আজকের সম্মেলনের উদ্বোধনী মুহূর্ত্তে অন্তরের অন্তস্থল থেকে গভীরশ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের প্রাণপ্রিয় রাহবার হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ.-কে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন। স্মরণ করছি সেসব আত্মাত্যাগী মর্দে মুজাহিদ ভাইদেরকে, যারা আযাদচেতা কওমের বিজয়কে ছিনিয়ে আনতে শাহাদাতের চলমান সিঁড়িতে পা রেখেছেন; অলসতায় গা ভাসিয়ে দেয়া জাতির হুশ ফিরাতে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। বিশ্বের তাবৎ শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে গিয়ে যেসব মর্দে মুজাহিদ ভাইয়েরা শাহাদাতের অমীয়া সূধা পান করেছেন এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার জন্য যারা হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন সে সকল শহীদানের মাগফেরাত ও বুলন্দ মর্যাদার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিযাদ করছি। বিশেষ করে মনে পড়ছে ২০০২ সালের তৎকালীন জোট সরকারের আমলে মসজিদ রক্ষার আন্দোলনে শাহাদাত বরণকারী সহযোদ্ধা ভাই হাফেজ আবুল বাশার, রেজাউল করীম ঢালী, হাফেজ ইয়াহইয়া ও বয়ঃজ্যোষ্ঠ জয়নাল আবেদীন ও সন্ত্রাসীদের নির্মম হামলায় শাহাদাত বরণকারী হাফেজ আবদুল মালেককে। আল্লাহ জান্নাতে তাদের দরজা বুলন্দ করুন। সাহসিকতার সাথে সকল জুলুম ও অন্যায়ের প্রাচীর ভাঙতে আমরা মহান আল্লাহর রহমত ও মদদ প্রার্থনা করছি।

সংগ্রামী সহযোদ্ধা ভাইয়েরা!

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা Might is right নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বের গুটি কয়েক শক্তিদ্বার শক্তির উন্মাদনায় মত্ত হয়ে শান্তিকামী মানুষগুলোর ওপর অশান্তির শৃঙ্খলা চাপিয়ে দিয়েছে। ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের আশীর্বাদপুষ্ট মার্কিন-বৃটেন পরাশক্তি গোটা বিশ্বের উপর সাম্রাজ্যবাদ ও জুলুমী শাসনব্যবস্থা কায়ম করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের পরিচয় নির্ণিত হচ্ছে মানুষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে। সারা বিশ্বের রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে সভ্যতার সংঘাততত্ত্বকে সামনে নিয়ে। মুসলমান মাত্রই শিকার হচ্ছে বহুমাত্রিক সহিংসতার। একেরপর এক সামরিক হামলার মাধ্যমে মুসলমানদের ধৈর্যের সব বাধ ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে। নির্মমতার চূড়ান্ত শিকার সেই মুসলমানেরাই যখন প্রতিরোধ গড়ে তুলছে তখনই তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে গালমন্দ করা হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের আত্মসী কর্মকাণ্ডের ফলেই বৈশ্বিক শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে। আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের বলব, আপনারা আত্মসী মনোভাব পরিহার করুন অন্যথায় বিশ্ব আপনাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করবে।

দেশ প্রেমিক ছাত্রজনতা!

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৪৪ বছর ধরে শুধু ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে, বদলায়নি জনতার ভাগ্য। দুর্নীতি-দুঃশাসনে জনগণ চরম দিশেহারা। ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠে শিক্ষাঙ্গণ। বস্তুবাদী, দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতালোভীদের

দেয়া অগ্নিবোমায় শত শত মানুষ পুড়ে মরছে। অপরদিকে জান-মালের নিরাপত্তায় নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় বাহিনীও ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীর ন্যায় একের পর এক বিচার বহির্ভূত খুন-গুমে লিপ্ত হচ্ছে। ভুক্তভোগী স্বজনহারা জনতার আহাজারী আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলছে। অশ্লীলতা-অসংস্কৃতি ও মাদকের চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে যুবসমাজ। জাতির আকাশে তীব্র আঁধার ঘনীভূত। স্বাধীনতার ৪৪বছরেও শোষণ ও বৈষম্য দূর হয়নি; বরং ধারণ করছে নতুন নতুন রূপ-রঙ, সুদ-ঘৃষ, টেন্ডারবাজি ও মজুদদারি। যার ফলে সমাজের এক প্রান্তে চলছে ভোগ-বিলাসিতার অট্টহাসি অপর প্রান্তে শোনা যায় অনাহারি মানুষের রোনারজারী। শান্তি ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেও অশান্তি, অপরাজনীতিতে বন্দী হয়ে আছে গোটা জাতি।

প্রিয় উপস্থিতি!

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আদর্শ পদ্ধতি নয়। তারপরেও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র মন্দের ভালো হিসেবে সরকার পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। আজকে সেই গণতন্ত্রও বিলুপ্তির পথে।

বাংলাদেশ ১৭ কোটি জনগণের এক বিশাল দেশ। বিশ্ব অর্থনীতির বিশাল বাজার আমাদের এই দেশ। সেই সাথে ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগতভাবেও বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে হওয়ায় বিশ্ব শক্তিগুলোর মনোজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।

সাম্প্রতিক বিদেশি নাগরিক হত্যাকাণ্ড, আইএস ও জঙ্গিবাদের ধোঁয়াশা তোলা এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সহায়তার আশ্বাসের প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্ব রাজনীতিতে সহিংস ধারার শিকার হতে যাচ্ছে।

বিপ্লবী সহযোদ্ধা বন্ধুগণ!

বেকারত্বের অভিশাপে যুবসমাজ আজ উদ্ভিন্ন। দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ২৫% বেকার। এই বেকার সমস্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে অনগ্রসরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। প্রশাসনকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতারা অযোগ্য হলেও গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের চাকুরি দেয়া হচ্ছে যার দরুণ প্রকৃত মেধাবীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

গার্মেন্টস সেক্টরে একেরপর এক সংকট অস্থিরতা দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের চক্রান্ত হিসেবেই আমরা মনে করি। গার্মেন্টস সেক্টরকে ধ্বংস করার দেশী-বিদেশী চক্রান্ত দেশের ছাত্র সমাজ সফল হতে দিবে না ইনশাআল্লাহ।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশ তার ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে। আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, উন্নয়ন-সমৃদ্ধি আজ বিপদগ্রস্ত।

সচেতন ছাত্রবন্ধুগণ!

আপনারা জানেন, বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল দুই বৃহত্তর জোটের অধীনে রাজনীতি করছে। যাদের মূল লক্ষ্যই ক্ষমতা, সেটা জনতার পোড়া মাংসে হোক বা জনতার বুকে গুলি চালিয়ে হোক। ক্ষমতা অধিষ্ঠিত দল শক্তি প্রয়োগ করে,

নির্মমভাবে হত্যা-গুম আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ক্ষমতায় টিকে আছে। সংসদে হাস্যকর বিরোধীদল প্রতিষ্ঠা করে সংসদটাকে পুতুল নাচের নাট্যশালায় পরিণত করেছে। অপরদিকে বিরোধী জোট ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সন্ত্রাসকে বেছে নিয়েছে।

সংগ্রামী উপস্থিতি!

আমরা ছাত্রসমাজ, ছাত্রসমাজকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রত্যেককে চিন্তা করতে হবে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোর প্রতি তাকালে মনে হয় সেখানে নিয়মিত যুদ্ধ চলছে। আজ কোন মা-বাবাই নিজ সন্তানকে বিদ্যাপীঠে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন না। সন্তানটি সুস্থভাবে বাড়িতে ফিরতে পারবে এই নিশ্চয়তা আমাদের সমাজ, আমাদের সরকার দিতে পারে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসলেও বর্তমান সরকার সমাজের শান্তি শৃঙ্খলার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। দেশের এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বারবার সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। হলদখল, ভর্তি বাণিজ্য আর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংগঠিত সহিংসতায় নিরীহ মেধাবী ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। নিরীহ ছাত্ররা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে। পুলিশী হয়রানির ভয়ে শিক্ষার্থীরা আজ আতংকিত। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি ও ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড আপনাদের অজানা নয়। আজ সরকার মহল থেকে ছাত্রদেরকে উস্কানী দেওয়া হচ্ছে। এই সরকারের আমলে তারই মদদপুষ্ট ছাত্রবাহিনীর মাধ্যমে প্রায় ৩০ জন ছাত্রকে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে হয়েছে। আজকের এই সম্মেলন থেকে এ সকল হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

সচেতন ছাত্রসমাজ!

আজ গভীর উদ্বেগের বিষয়! জাতি গড়ার কারিগর শিক্ষকসমাজ তাদেরকে রাস্তা-ঘাটে, প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসে, যেভাবে অপমান-অপদস্থ, হয়রানি ও ক্ষতবিক্ষত করা হচ্ছে, এটা কোন সভ্য সমাজের কাজ হতে পারে না। ছাত্রদের জন্য শিক্ষক হচ্ছেন মাথার তাজ সমতুল্য। একজন ছাত্র কিভাবে একজন শিক্ষককে আক্রমণ করতে পারে তা আমাদের বুঝে আসে না। লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে যায়; যখন শুনি রাস্তায় লাঠিপেটা খেয়ে পড়ে থাকা একজন শিক্ষকের ক্লেশ আত্ননাদ। আজ পুলিশ ভাইদেরকে বলতে চাই, আপনারা কাকে লাঠিপেটা করছেন? কাকে পায়ের বুট দ্বারা আঘাত করেছেন? কার শরীরে লাথি মারছেন? একটু চিন্তা করুন। যদি জেনে বুঝেই করে থাকেন তাহলে অপেক্ষা করুন; আল্লাহর গজব অত্যাসন্ন। আজকের সম্মেলন থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, শিক্ষকদেরকে এভাবে রাস্তা-ঘাটে অপমানিত করবেন না। শিক্ষকদের যাতে বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করতে না হয় সেজন্য তাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। তারা জাতির শিক্ষক তাদের মর্যাদা উন্নত করতে, বাদশাহ আলমগীরের জীবনী থেকে শিক্ষা নিন। অন্যথায় আপনাদের ইতিহাস জাতি ঘৃণার সাথে স্মরণ করবে।

প্রিয় বন্ধু!

বাংলাদেশের শোষিত-বঞ্চিত জনতাকে প্রকৃত শান্তি ও মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে একমাত্র ইসলামী খেলাফত। ইতিহাস স্বাক্ষী; পৃথিবীতে যতদিন ইসলামের সোনালী খেলাফত কায়েম ছিল ততদিন এই ধরাপৃষ্ঠ ছিল এক স্বর্গীয় উদ্যান। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯১ সালের ২৩ আগস্ট একঝাঁক দায়িত্ববান, মেধাবী ও সচেতন ছাত্রদেরকে নিয়ে গঠিত হয় ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সুদীর্ঘ ২৪ বছর যাবত ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, সু-শৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

আজ যখন অপরাপর ছাত্র সংগঠনগুলো সন্ত্রাসী ও জঙ্গি সংগঠনে পরিণত হয়েছে, ঠিক এই সময়ে গণমানুষের একমাত্র আস্থা ও নির্ভরতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে বাংলাদেশের একমাত্র সন্ত্রাস ও ক্যাডারমুক্ত সংগঠন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন। যা মুহাম্মদ সা. এর কালজয়ী আদর্শ ধারণের মাধ্যমে এদেশে একটি স্বতন্ত্র ধারার বিকল্প ছাত্র রাজনীতির দৃষ্টান্ত স্থাপনের ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা যোগ্য নেতৃত্ব, সুচিন্তিত কর্মসূচির অধীনে ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত গতিতে এদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করে চলেছি। আমাদের পথচলার নীতি ছিলো, গণদাওয়াতের মাধ্যমে গণচেতনতা সৃষ্টি করে জনতার মাঝ থেকে ইসলামের জন্য গণদাবী উত্থাপন করে গণবিপ্লব সাধন করা। এ লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশের ত্রিধারা শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীদের নিয়ে এমন একদল নেতৃত্ব তৈরি করেছি যারা সমকালীন সমস্যাকে ইসলামের আলোকে সমাধান করে জাতির চলার পথ তৈরি করে দিতে পারে। আমরা জনতার বিশেষত ছাত্রদের সকল অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি রোধে আমরা প্রবল আন্দোলন করেছি। শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্যে সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করেছি। ইসলাম নিয়ে কটুজিকারী এক শ্রেণির ব্লগার ও রাজনীতিবিদদের প্রতিরোধে আমরা রাজপথে থেকেছি। মায়ানমার, ফিলিস্তিন ও ইরাকসহ বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের নির্যাতন করা হচ্ছে, তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনে আমরা অগ্রভাগে রয়েছি। বন্যা দুর্গতদের কাছে আমরা ত্রাণ নিয়ে ছুটে গিয়েছি। বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি আসা আঘাতগুলোকে মোকাবিলা করেছি। বিদেশি বিশেষত ভারতীয় অপসংস্কৃতির প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছি।

আমরা তৈরি করতে চেয়েছি এমন একটা তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজ, যারা তাদের স্বজাতির ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, যারা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত, যারা ৭১ এ তাদের পূর্বপুরুষের বীরত্বগাঁথা সম্পর্কে সচেতন। আমরা এমন একদল তরুণকে জাগ্রত করতে চেয়েছি যারা এই ভূখণ্ডকে সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ এনে দেবে। যারা মানুষের চির আকাজক্ষিত মুক্তি এনে দেবে।

আমরা আমাদের লক্ষ্যে অটুট ছিলাম এবং আছি। আল্লাহর রহমতে আমরা আমাদের কাজক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছে যাবো ইনশাআল্লাহ।

উপস্থিত নবাগত বন্ধুগণ!

দু-এক বছর নয়; চব্বিশ বছরের সোনালী ইতিহাস। ২৪ বছরে আমাদের পাড়ি দিতে হয়েছে অনেক কষ্টকাকীর্ণ বন্ধুরপথ। ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর বারবার নেমে এসেছে সীমাহীন জুলুম নির্যাতন। আমাদের আদর্শিক যাত্রাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছে মাঝপথে। তাগুতি শক্তির শকুনের শ্যাণ্ডুষ্টি সবসময় আমাদের দিকে। তবুও আমরা থেমে যাইনি, দমে যাইনি। আমরা চলেছি দুর্বীর-দুরন্ত গতিতে। যেখানেই জুলুম নির্যাতন সেখানেই প্রতিবাদী কণ্ঠ ইশা ছাত্র আন্দোলন। ছাত্রসমাজের অধিকারসহ গণমানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য ইশা ছাত্র আন্দোলন সবসময় সোচ্চার। দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কাছে ইশা ছাত্র আন্দোলন কখনো পরাজিত হয়নি, মাথা নত করেনি এবং আপোষও করেনি বাতিলের সাথে। ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামে আমাদের কোন কালিমা নেই। আল্লাহর জমিনে কুরআনী শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা দিতে চাই অশান্ত পৃথিবীকে শান্তির ঠিকানা।

বিজয় আকাশী বন্ধুরা!

ইসলাম এসেছে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য; পরাজিত অবস্থায় থাকার জন্য নয়। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে দ্বীনবিজয়ের আহ্বান এভাবেই এসেছে, ‘দ্বীনকে অপরাপর সকল মতবাদের উপর বিজয়ী করে দাও।’ এ আহ্বানে সাড়া দিতেই আমরা দ্বীন বিজয়ের আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছি। যতদিন পর্যন্ত সাংবিধানিক কাঠামোতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবেই ইনশা আল্লাহ।

সচেতন ছাত্র ভাইয়েরা!

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এ দেশের রাজনীতিতে এক ব্যতিক্রম ধারা সৃষ্টি করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ছাত্র আন্দোলন প্রচলিত ছাত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। ছাত্র আন্দোলন চায় ছাত্র রাজনীতিতে নৈতিকতা ও আদর্শ চর্চার পরিবেশ তৈরি হোক, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসুক, লেজুড়বৃত্তির হীন রাজনীতি বন্ধ হয়ে চরিত্র গঠনের কর্মসূচিতে ছাত্র রাজনীতি সমৃদ্ধ থাকুক। আজকের এ সম্মেলন থেকে দেশের সর্বশ্রেণির সচেতন ছাত্র সমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি- আসুন, সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্র রাজনীতির কবর রচনা করে মেধানির্ভর ছাত্র রাজনীতি প্রবর্তনে সংঘবদ্ধ হই। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং আদর্শ ও দক্ষ জাতিগঠনে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমুখী সর্বজনীন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হই। মানবতার ধ্বজাধারীদের উপযুক্ত জবাব দিতে শাহজালাল, শাহপরান, সৈয়দ এসহাক, সৈয়দ ফজলুল করীম রহ.-এর বাংলাদেশে সকল আত্মসী শক্তির মোকাবেলায় দীপ্ত শপথ গ্রহণ করি। বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থার শৃঙ্খল ভেঙ্গে জালাতী পথের সহযাত্রী হই। মরীচিকার পিছনে না ছুটে সত্য-ন্যায়ের মশাল জ্বালাই-মানবগড়া মতবাদের ধ্বংস স্তরের উপরে ইসলামী বিপ্লবের পতাকা উড়াই।

সহযোদ্ধা ও সহকর্মী বন্ধুগণ!

মেধাবী ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বকারী বৃহত্তর ছাত্র সংগঠনের সদস্য, কর্মী ও মুবাল্লিগ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব অনেক। যুগের সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য

নিজেকে সযত্নে প্রস্তুত করতে হবে। স্বচ্ছ ও সঠিক নিয়ত, নিরঙ্কুশ খুলুসিয়াত এবং উন্নত আমলের অপূর্ব সম্মিলন ঘটাতে হবে। নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। নিজেদের মাঝে বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা, সর্বোন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। ইশা ছাত্র আন্দোলনের এ মহান দাওয়াতকে পৌঁছে দিতে হবে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গঠন করতে হবে ছাত্র আন্দোলনের মজবুত কমিটি।

ছাত্র বন্ধুরা!

সময় এসেছে নতুন করে শপথ নেবার, দৃষ্ট অঙ্গীকারে জেগে ওঠার। ছাত্র আন্দোলনের আজ লক্ষ লক্ষ সদস্য-কর্মী, শহীদী কাফেলার দুঃসাহসী সৈনিক। আমরা যদি হাতে হাত রেখে শহীদী তামান্না নিয়ে বদরের ডাক দিতে পারি, দৃঢ় বিশ্বাস বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবেই ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, সম্মেলনের সার্বিক সফলতার জন্য মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের দরবারে নুসরত ও মদদ কামনা করছি। সম্মেলন প্রস্তুতিতে সহযোদ্ধা ও সহকর্মী দায়িত্বশীল ভাইদের ত্যাগ ও কুরবানী এবং বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতা করছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দরবারে এলাহীতে তাদের উত্তম জাযাখাণ্ডির জন্য দু'আ করছি।

আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ইশা ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই সম্মেলনকে মহান রাক্বুল আলামীন দীন বিজয়ের পাথেয় হিসেবে কবুল করুন। আমীন ॥

বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব থেকে বঙ্গভঙ্গ

জি.এম. রুহুল আমীন

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলার শাসন ব্যবস্থা বহুকাল পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে শুরু হয়েছিল। ইতিহাসের তথ্য উপাত্তে খ্রিস্টপূর্ব থেকেই এ বাংলার শাসন ব্যবস্থার প্রমাণ মিলে। তবে বাংলার ইতিহাস সঠিকভাবে জানা শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর। এ অসুবিধা আরও বেশি অনুভূত হয় প্রাচীনকাল থেকে খ্রিস্টীয় চার শতকে বাংলায় গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। এ সময়ের ইতিহাসের উপাদানের জন্য নির্ভর করতে হয় বৈদিক, মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের অপর্যাপ্ত তথ্য ও প্রাপ্তিসাধ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির ওপর। গুপ্তযুগ থেকে পরবর্তী সময়ের জন্য আমরা প্রস্তরাদিতে উৎকীর্ণ লিপি ও সাহিত্যিকারে লিখিত তথ্যাদি পাই। এসব তথ্যে বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। জানা যায় যে, সর্বপ্রাচীনকালে বাংলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত এবং যে অঞ্চলে যে জনগোষ্ঠী বাস করত সে অঞ্চল সেই জনগোষ্ঠীর নামে পরিচিত হত। এভাবে বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ় ও গৌড় নামক প্রাচীন জনপদসমূহ অনার্য জনগোষ্ঠীর দ্বারা এ সব নামের অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মেঘনার ওপারে সমতট (কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল) ছিলো একটা গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। এ জনপদের নাম পুরোপুরি বর্ণনাত্মক এবং জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা বর্জিত। চট্টগ্রাম ও তৎসংশ্লিহিত অঞ্চল হরিকেল নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে অনার্য জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে এ সকল জনপদের কথা জানা যায়। আমরা অত্র প্রবন্ধে খ্রিস্টপূর্ব থেকে বঙ্গভঙ্গকাল পর্যন্ত আলোচনা করব।

গঙ্গাঋদ্ধি রাজ্য : গঙ্গাঋদ্ধি (গ্রিকভাষায় এর অর্থ “গঙ্গার সম্পদ”) খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ শতকের একটি রাজ্য। ভারতীয় উপমহাদেশে বঙ্গ অঞ্চল বা বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস তার ইন্ডিকা নামক গ্রন্থে এই রাজ্যের কথা উল্লেখ করেন। গ্রিক ও লাতিন ঐতিহাসিকদের মতে, আলেকজান্ডার তার ভারতবর্ষ অভিযান থেকে সরে এসেছিলেন। কেননা সরে না আসলে তাকে গঙ্গাঋদ্ধি আক্রমণ করতে হতো। আলেকজান্ডার আশঙ্কা করেছিলেন, গঙ্গাঋদ্ধি সাম্রাজ্য আক্রমণ করার পরিণতি হবে ভয়াবহ। তবে এখন পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। দ্রুপদী গ্রিক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিকগণ গঙ্গাঋদ্ধি রাজ্যের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, ‘গঙ্গা নদী উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত এবং গঙ্গারিডাই রাজ্যের পূর্ব সীমানায়

সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে” মেগাস্থিনিস। ‘গঙ্গারিডাই রাজ্য ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙলা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল’ গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস তার ইন্ডিকা গ্রন্থে এটাও বর্ণনা করেছেন। ধ্রুপদী গ্রিক এবং ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী আলেকজান্ডার দি গ্রেট বাংলায় অবস্থিত এই গঙ্গারিডির লোকদের পরাক্রমের কাহিনী শুনে শংকিত হয়ে যমুনার পশ্চিম পাড় থেকেই ফেরৎ চলে যান। আলেকজান্ডার ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ডিওডোরাস (৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-১৬ খ্রিস্টাব্দ) সিন্ধু পরবর্তী দেশ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, গঙ্গা পেরিয়ে যে অঞ্চল সেখানে ‘প্রাসিয়ই’ ও গঙ্গারিডাইদের আধিপত্য। উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গঙ্গারিডাইর রাজা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। রাজার ১০০০ অশ্বরোহী, ৭০০ হস্তি এবং ৬০০০০ পদাতিক সৈন্য নিয়ে সজ্জিত সেনাবাহিনী ছিল।

বঙ্গ : বঙ্গ হলো ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বভাগে অবস্থিত একটি প্রাচীন রাজ্য। এই রাজ্যটি এখন রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত বঙ্গ অঞ্চলে (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) অবস্থিত ছিল। এটি ছিল দক্ষিণ এশিয়ার একটি সমুদ্রচারী রাজ্য। মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ রাজ্য তিনটাকে ভারতবর্ষ বা প্রাচীন ভারতের নিকটবর্তী রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১২ বছর তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে অর্জুন বঙ্গ ও কলিঙ্গের সকল পবিত্রস্থানে এসেছিলেন। পূর্বাঞ্চলের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুক্ষ্ম এই পাঁচটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একই বংশের সন্তান। এরা ছিলেন গিরিব্রজ শহরের কাছে অবস্থিত মগধ রাজ্যের অধিবাসী গৌতম দীর্ঘতম ঋষির ঔরসজাত এবং বলি রাজার দত্তক পুত্র। কর্ণের অঙ্গ রাজ্য জয় করার পর ভীম পার্বত্য অঞ্চলের এক শক্তিশালী রাজাকে পরাস্ত করেন। এরপর মদগিরির রাজাকে পরাস্ত করার পর পাণ্ডুবংশ পুণ্ড্র অঞ্চলের রাজা বাসুদেব ও কৌশিক মচ্ছের রাজা মহৌজকে পরাজিত করেন। তারপর তাঁরা বঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। সমুদ্র সেন ও তাম্রলিঙ্গের রাজা চন্দ্রসেনকে পরাজিত করে তাঁরা সুক্ষ্ম রাজ্যের কৈবর্ত রাজাদের পরাজিত করেন। এরপর তাঁরা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের রাজাদের পরাজিত করেন। এরপর তাঁরা লৌহিত্য রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন। ভার্গব রাম কাশ্মীর, দারদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, তাম্রলিঙ্গ, রক্ষোবাহ, বিতাহোত্র, ত্রিগার্ত ও মার্তিকাবত রাজ্য জয় করেছিলেন। বঙ্গ সেনাবাহিনী যুদ্ধহস্তী পরিচালনায় দক্ষ ছিল। কলিঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে তাঁরাও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষ নেয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় বঙ্গের রাজা ছিলেন ভগদত্ত।

পুণ্ড্র : পুণ্ড্র ভারতীয় মহাকাব্যগুলিতে বর্ণিত একটি পৌরাণিক রাজ্যের নাম। এই রাজ্যটি পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্র বা পুর্ণিয়া নামেও পরিচিত। বর্তমান ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারের পুর্ণিয়া অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ অঞ্চল ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল পৌণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনৈক পৌণ্ড্র রাজা নিজেকে “পৌণ্ড্রক বাসুদেব” ঘোষণা করে বাসুদেব কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পৌণ্ড্রনগর যা বর্তমানে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত, এটি বর্তমান বগুড়ায় অবস্থিত। মহাভারত অনুযায়ী, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুক্ষ্ম - এই পাঁচটি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা একই বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁরা রাজা বলির পুত্র

ছিলেন। মহাভারতে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র ভারতবর্ষের একটি রাজ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। পৌণ্ড্ররাজ্য বৈদিক আচার আচরণের বিরোধী ছিল। তাদের নিজস্ব উন্নত সংস্কৃতি ছিল যা বৈদিক সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

সুক্ষ্ম : সুক্ষ্ম ছিল একটি পূর্ব রাজ্য অঞ্চল যা এখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত। মহাভারত অনুযায়ী, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুক্ষ্ম- এই পাঁচটি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা একই বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁরা রাজা বলির, গৌতম দিরঘাতামাস নামে এক ঋষির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন যিনি গিরিভরাজার নিকটবর্তী মগধ এ বাস করতেন।

অঙ্গ : অঙ্গ প্রাচীন ভারতের একটি রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৬ শতকের দিকে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে এটি বিকাশ লাভ করে কিন্তু ওই শতাব্দীতেই এটি মগধ দ্বারা অধীকৃত হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ যেমন: অঙ্গুত্তরা নিকায়াতে উল্লিখিত ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে অঙ্গ অন্যতম। প্রাচীন জৈন গ্রন্থ ভৈক্ষপ্রাজ্ঞাপ্তির (যা ভগবতী সূত্র নামে সাধারণত পরিচিত) প্রাচীন জনপদের তালিকাতেও অঙ্গের উল্লেখ আছে। কারো কারো মতে, অঙ্গের বাসিন্দারা ছিল মিশ্র জাতিসত্তার, বিশেষত পরবর্তী কালে। মহাভারত ও পৌরাণিক সাহিত্য মতে অঙ্গ নামটির উৎপত্তি হয়েছে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যুবরাজ অঙ্গের নামানুসারে। রামায়ণে বলা হয়েছে, অঙ্গ নামটির উৎপত্তি হয়েছে সেই স্থানের নাম থেকে, যেখানে শিব কামদেবকে পুড়িয়ে হত্যা করে এবং যেখানে তার শরীরের অংশসমূহ (অঙ্গ) ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

হরিকেল : হরিকেল ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন বাংলার সাম্রাজ্য। মূলত এটি প্রাচীন পূর্ববঙ্গের একটি জনপদ। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতীয় লেখকগণ পূর্বভারতীয় একটি অঞ্চলকে হরিকেল বলে উল্লেখ করেন। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এর অবস্থান নির্দেশ করেছেন পূর্বভারতের পূর্বসীমায়। নবম শতাব্দীর সাহিত্যকর্ম কর্তৃরমঞ্জরীতে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে হরিকেলের নারীদের পূর্ব বঙ্গীয় নারীদের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হয়। তবে হিউয়েন সাঙ কিংবা অন্য কেউ এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিশদ কোনো বিবরণ দেন নি।

প্রায় চারহাজার বছরের পুরনো তাম্রযুগেরধ্বংসাবশেষ বাংলায় পাওয়া গিয়েছে। ইন্দো-আর্যদের আসার পর অঙ্গ, বঙ্গ এবং মগধ রাজ্য গঠিত হয় খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকে। এই রাজ্যগুলি বাংলা এবং বাংলার আশেপাশে স্থাপিত হয়েছিল। অঙ্গ, বঙ্গ এবং মগধ রাজ্যের বর্ণনা প্রথম পাওয়া যায় অথর্ববেদে প্রায় ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে বাংলার বেশিরভাগ এলাকাই শক্তিশালী রাজ্য মগধের অংশ ছিল। মগধ ছিল একটি প্রাচীন ইন্দো-আর্য রাজ্য। মগধের কথা রামায়ণ এবং মহাভারতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময়ে এটি ছিল ভারতের চারটি প্রধান রাজ্যের মধ্যে একটি। মগধের ক্ষমতা বাড়ে বিম্বিসারের (রাজতুকাল ৫৪৪-৪৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এবং তার ছেলে অজাতশত্রুর (রাজতুকাল ৪৯১-৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আমলে। বিহার এবং বাংলার অধিকাংশ জায়গাই মগধের ভিতরে ছিল।

৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সেনাবাহিনী মগধের নন্দ সাম্রাজ্যের

সীমানার দিকে অগ্রসর হয়। এই সেনাবাহিনী ক্লান্ত ছিল এবং গঙ্গা নদীর কাছাকাছি বিশাল ভারতীয় বাহিনীর মুখোমুখি হতে ভয় পেয়ে যায়। এই বাহিনী বিয়াসের কাছে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আরও পূর্বদিকে যেতে অস্বীকার করে। আলেকজান্ডার তখন তাঁর সহকারী কইনাস এর সাথে দেখা করার পরে ঠিক করেন ফিরে যাওয়াই তার জন্য ভাল। মৌর্য সাম্রাজ্য মগধেই গড়ে উঠেছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। এই সাম্রাজ্য অশোকের রাজত্বকালে দক্ষিণ এশিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান অবধি বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্য মগধেই গড়ে ওঠে যা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাংশে এবং পারস্য ও আফগানিস্তানের কিছু অংশে বিস্তার লাভ করেছিল।

গৌড় রাজ্য : বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা ছিলেন শশাঙ্ক, তিনি প্রাচীন বাংলার একজন শাসক। তিনি বাংলার বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যকে একত্র করে গৌড় নামের জনপদ গড়ে তোলেন। খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করেছেন বলে ধারণা করা হয়। যিনি ৬০৬-৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কারো কারো মতে, তিনি ৬০০-৬২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা। বাংলার ইতিহাসে তিনি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। সম্ভবত তিনি গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে একজন সামন্তরাজা ছিলেন। তিনি সম্ভবত হর্ষবর্ধন এর ভগিনী রাজ্যশ্রীকে অপহরণ করেছিলেন। এইজন্য হর্ষবর্ধন এর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। তাঁর শক্তি বৃদ্ধি হতে দেখে কামরূপ রাজা ভাস্করবর্মন তাঁর শত্রু হর্ষবর্ধন এর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্ক এর মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্যের পতন ঘটে এবং বাংলাতে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় যাকে বাংলায় মাৎস্যন্যায় বলা হয়।

মাৎস্যন্যায় : ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে গৌড় রাজা শশাঙ্ক এর মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে একঘোরতর নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয় যা প্রায় দেড়শো বছর স্থায়ী হয়। এই সময় বাংলাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়, আত্মকলহ, গৃহযুদ্ধ, গুপ্তহত্যা, অত্যাচার প্রভৃতি চরমে ওঠে। বাংলার সাধারণ দরিদ্র মানুষদের দুর্দশার শেষ ছিল না। স্থায়ী প্রশাসন না থাকাতে বাহুবলই ছিল শেষ কথা।

পাল বংশ : মাৎস্যন্যায়ের সময় বাংলার বিচ্ছিন্নতা দমনের জন্য বাংলার মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে গোপাল নামক এক সামন্তরাজাকে বাংলার রাজা হিসেবে গ্রহণ করেন। গোপালই হলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাল বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী দুই রাজা ছিলেন ধর্মপাল এবং দেবপাল। নিম্নে তাদের ধারাবাহিক শাসনামল তুলে ধরা হল।

পাল বংশের শাসনামল

প্রথম গোপাল (৭৫০-৭৭০) : গোপাল ছিলেন বাংলার পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ৭৫০-৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পাল রাজাদের নামের শেষে “পাল” শব্দাংশটির অর্থ “রক্ষাকর্তা”। তাঁদের সঠিক জাতি পরিচয় জানা যায় না। তবে তিব্বতী বৌদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ ও খালিমপুর তাম্রলিপির ভাষ্যানুসারে, গৌড়রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এক শতাব্দীকাল ছিল বাংলার ইতিহাসে ঘোর অরাজকতা ও

গৃহবিবাদের যুগ। বাংলা ইতিহাসে এই যুগটি “মাৎস্যন্যায়” নামে পরিচিত। মৎস্য জগতে বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে খায়, তেমনি বাংলায় এই সময় শক্তিমানেরা দুর্বলদের উপর নিরন্তর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। দেশের জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রৌপ্যমুদ্রার আদান প্রদান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি বাংলার প্রধান বন্দর তামলিগু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বাংলার এই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে মুক্তি পেতে, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ‘প্রকৃতিপুঞ্জ’ অর্থাৎ বাংলার প্রধান নাগরিকবৃন্দ গোপাল নামে এক জনপ্রিয় সামন্ত নেতাকে বাংলার রাজপদে নির্বাচিত করেন। গোপালের রাজত্বকাল বা রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, তিনি সমগ্র বাংলা অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গোপাল ২০ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল রাজা হন।

ধর্মপাল (৭৮১-৮২১) : ধর্মপাল ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলা অঞ্চলের পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শাসক। তিনি পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি পৈত্রিক রাজত্বের সীমানা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেন এবং পাল সাম্রাজ্যকে উত্তর ও পূর্ব ভারতের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯০-৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধর্মপালের সিংহাসনে আরোহণের সময়কাল হিসেবে অনুমান করেছেন এবং নীহাররঞ্জন রায়ের মতে তিনি ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এছাড়া রমেশচন্দ্র মজুমদার ৭৭০-৮১০ খ্রিস্টাব্দে, আবদুল মোমিন চৌধুরী ৭৮১-৮২১ খ্রিস্টাব্দে, বিন্দেশ্বরী প্রসাদ সিনহা ৭৮৩-৮২০ খ্রিস্টাব্দে এবং দীনেশচন্দ্র সরকার ৭৭৫-৮১২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপালের রাজত্বের সময়কালকে নির্ণয় করেছেন। তাঁর অধিকারে বর্তমান মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও পাকিস্তানের সিন্ধু নদ উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ধর্মপাল সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বর হন। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিক্রা পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯০-৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে, রমেশচন্দ্র মজুমদার ৭৭০-৮১০ খ্রিস্টাব্দে, আবদুল মোমিন চৌধুরী ৭৮১-৮২১ খ্রিস্টাব্দে, বিন্দেশ্বরী প্রসাদ সিনহা ৭৮৩-৮২০ খ্রিস্টাব্দে এবং দীনেশচন্দ্র সরকার ৭৭৫-৮১২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপালের রাজত্বের সময়কালকে নির্ণয় করেছেন। উপত্যকা ত্রিভুবনপাল ও দেবপাল নামক তাঁর দুই পুত্রের নাম পাওয়া গেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিভুবনপাল পিতার রাজত্বকালেই মৃত্যুবরণ করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র দেবপাল পিতার উত্তরাধিকারী হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দেবপাল (৮২১-৮৬১) : দেবপাল পাল বংশের তৃতীয় রাজা। তাঁর সময়ে এ বংশের উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ অপ্রতিহতভাবে অব্যাহত ছিল। ধর্মপাল এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী দেবপালের রাজত্বকাল ছিল দীর্ঘস্থায়ী। নিজের এবং উত্তরসূরীদের তাম্রশাসনে দেবপালের রাজ্য সম্প্রসারণের সাফল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। এতে রাজ্য পরিচালনার অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় নাগভট্টের পর প্রতীহার সিংহাসনে দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আরোহণ এবং রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষের নিষ্ক্রিয়তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ

রাখতে দেবপালকে সুযোগ করে দেয়। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি সম্ভবত একটি বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন। একই সঙ্গে তাঁর পিতা ধর্মপালের সময় থেকে শুরু হওয়া ত্রিপুরক্ষীয় সংঘর্ষও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। এটি নিশ্চয়ই দেবপালের কৃতিত্ব যে, বিরোধীদের আক্রমণ থেকে তিনি নিজ রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রথম বিগ্রহপাল, মহেন্দ্রপাল ও প্রথম শূরপাল (৮৬১-৮৬৬) : প্রথম বিগ্রহপাল পাল সাম্রাজ্যের ষষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। ভাগলপুরের আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তিনি পাল সম্রাট ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকপালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্র ছিলেন এবং পরবর্তী পাল সম্রাট নারায়ণপালের পিতা ছিলেন। ঐতিহাসিকেরা দেবপালের পরবর্তী পাল সম্রাট হিসেবে প্রথম শূরপাল বা প্রথম বিগ্রহপালের উল্লেখ করতেন। কিন্তু ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ জগজ্জীবনপুর নামক স্থানে প্রাপ্ত মহেন্দ্রপালের একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, দেবপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী হিসেবে মহেন্দ্রপাল পরবর্তী সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাম্রশাসনটিতে মহেন্দ্রপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে প্রথম শূরপালের নাম রয়েছে যিনি মহেন্দ্রপালের পরবর্তী সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার ৮৫০-৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে, আবদুল মোমিন চৌধুরী ৮৬১-৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে, বিন্দেশ্বরী প্রসাদ সিনহা ৮৬০-৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে এবং দীনেশচন্দ্র সরকার ৮৫৮-৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিগ্রহপালের রাজত্বের সময়কালকে নির্ণয় করেছেন। এর মধ্যে প্রথম তিনজন মনে করেন প্রথম শূরপাল ও প্রথম বিগ্রহপাল একই সময়ে পৃথক স্থানে রাজত্ব করতেন। প্রথম বিগ্রহপাল হৈহয় রাজবংশের লজ্জাদেবীকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের নারায়ণপাল নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, যিনি পরবর্তী পাল সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নারায়ণপাল (৮৬৬-৯২০) : নারায়ণপাল পাল সাম্রাজ্যের সপ্তম সম্রাট ছিলেন। তিনি পাল সম্রাট প্রথম বিগ্রহপাল ও হৈহয় রাজবংশের লজ্জাদেবীর সন্তান ছিলেন। সুদীর্ঘ চুয়ান্ন বছর রাজত্ব করলেও নারায়ণপালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের অনেকাংশ অন্যান্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মগধ, তীরভুক্তি ও বঙ্গ পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও তাঁর সপ্তদশ রাজ্যাক্ষের পরে গুর্জররাজ ভোজদেব এই সকল অঞ্চল জয় করেন। ভোজদেব তাঁর অধীনে সামন্তদের সহায়তায় বারানসী জয় করে মগধ আক্রমণ করে নারায়ণপালকে পরাজিত করেন বলে অনুমান করা হয়। এই যুদ্ধে ভোজদেবের সামন্তরূপে প্রতীহার বংশীয় কক্ক মুদগিরিতে গৌড় রাজা বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। কলচুরী রাজবংশের প্রথম গুণাভ্যোধিদেব ভোজদেবকে গৌড় আক্রমণে সহায়তা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার ৮৫৪-৯০৮ খ্রিস্টাব্দে, আবদুল মোমিন চৌধুরী ৮৬৬-৯২০ খ্রিস্টাব্দে, বিন্দেশ্বরী প্রসাদ সিনহা ৮৬৫-৯২০ খ্রিস্টাব্দে এবং দীনেশচন্দ্র সরকার ৮৬০-৯১৭ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণপালের রাজত্বের সময়কালকে নির্ণয় করেছেন।

রাজ্যপাল (৯২০-৯৫২) : রাজ্যপাল পাল সাম্রাজ্যের অষ্টম সম্রাট ছিলেন। পাল সম্রাট নারায়ণপালের মৃত্যুর পর রাজ্যপাল পাল রাজবংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রকূট রাজবংশের তুঙ্গ নামক নরপতির কন্যা ভাগ্যদেবীকে বিবাহ

করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, তুঙ্গধর্মাবলোক নামক রাজাই ছিলেন রাজ্যপালের শ্বশুর। বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, রাজ্যপাল বহু গভীর জলাশয় ও উচ্চ দেবালয় নির্মাণ করে ছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার ১০৮-১৪০ খ্রিস্টাব্দে, আবদুল মোমিন চৌধুরী ও বিন্দেশ্বরী প্রসাদ সিনহা ১২০-১৫২ খ্রিস্টাব্দে এবং দীনেশচন্দ্র সরকার ১১৭-১৫২ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যপালের রাজত্বের সময়কালকে নির্ণয় করেছেন।

দ্বিতীয় গোপাল (১৫২-১৬৯) : দ্বিতীয় গোপাল পাল সাম্রাজ্যের নবম সম্রাট ছিলেন। পাল সম্রাট রাজ্যপালের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় গোপালের শাসনাধীনে মগধ ছিল বলে মনে করা হয়, কারণ তাঁর রাজত্বকালে মগধে প্রতিষ্ঠিত দুইটি মূর্তি ও মগধে লিখিত একটি বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রিপুরার মম্বুক নামক গ্রামে দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছরে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তি এবং মালদহ জেলার গাজোল থানার জাজলপাড়া গ্রামে তাঁর একটি তাম্রপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম বছরে তিনি নালন্দায় একটি বাগেশ্বরী মূর্তি তৈরি করান। রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৪০-১৫৭ খ্রিস্টাব্দে, আবদুল মোমিন চৌধুরী ১৫২-১৬৯ খ্রিস্টাব্দে, বিন্দেশ্বরী প্রসাদ সিনহা ১৫২-১৬৭ খ্রিস্টাব্দে এবং দীনেশচন্দ্র সরকার ১৫২-১৭২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বের সময়কালকে নির্ণয় করেছেন।

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (১৬৯-১৯৫) : দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এর সময়কালে সাম্রাজ্য উত্তর ভারতের প্রতীহার সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর উদীয়মান শক্তি চণ্ডাল ও কলচুরীদের একাধিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। চণ্ডাল ও কলচুরীদের সূত্রগুলিতে বাংলার বিভিন্ন অংশ পৃথকভাবে অঙ্গ, রাঢ়, গৌড় এবং বঙ্গাল হিসেবে উল্লেখ্য করা হয়েছে; এ থেকে সম্ভবত এ সময় বাংলার অভ্যন্তরেই বিভিন্ন স্বাধীন অঞ্চল ছিল বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে চন্দ্ররা পালদের পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন স্বীকৃত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। পাল রাজ্যসীমার মধ্যেই কখোজ গৌড় পতিরী উত্তর-পশ্চিম বাংলায় নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রথম মহীপালের আগে কিছু সময়ের জন্য পাল রাজ্য অঙ্গ ও মগধেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

প্রথম মহীপাল (১৯৫-১০৪৩) : প্রথম মহীপাল ছিলেন পাল বংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একজন শক্তিশালী রাজা। পাল বংশ শাসনামলে যখন তার গৌরব হারাতে হারাতে একদম দুর্বল হয়ে পড়ে তখন প্রথম মহীপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। তার পক্ষে পাল বংশের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে না পারলেও পাল সাম্রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। প্রথম মহীপাল ছিলেন একজন জনদরদী শাসক। তিনি প্রজাদের সুবিধার্থে নানা স্থানে বহু বড় বড় দিঘি খনন করেন। তিনি ১৯৫-১০৪৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৮ বছর রাজত্ব করেন।

নয়পাল (১০৪৩-১০৫৮) : তিনি প্রথম মহীপালের পুত্র ছিলেন। তার বাবার মৃত্যুর পর তিনি শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তার রাজত্বকালে কলচুরীরা জগদ্যদেবের পুত্র কর্তৃক বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে নয়পাল পরাজিত হন।

যদিও অতীশ দীপঙ্কর এর মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘটেছিল। কিন্তু কর্ত পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধেও কর্ত প্রথমে জয়লাভ করেন।

তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৮-১০৭২) : তিনি ছিলেন পাল রাজবংশের দ্বাদশ রাজা। ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাল রাজবংশের একাদশতম রাজা নয়পাল এর মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন। আর দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৬০-৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন পালবংশের অষ্টম রাজা। কলচুরীদের সাথে নয়পাল এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের দীর্ঘকালীন যুদ্ধে পালদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয় এবং সেনা শক্তি কমে যায়। এই সুযোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এদের ভিতরে উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলো ছিল, ঢেংকরীর মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের রাজ্য, বর্মণগণের পূর্ববঙ্গের রাজ্য, দিব্যের বরেন্দ্রাঞ্চলের রাজ্য, পট্টিকের কুমিল্লা অঞ্চলের রাজ্য। এই সময়ে কর্ণাটকের চালুক্যরা বাংলাদেশ আক্রমণ করে গৌড়ের কিয়দংশ এবং কামরূপ অঞ্চল দখল করেন। প্রায় একই সময়ে উড়িষ্যার রাজা বাংলাদশের গৌড় এবং রাঢ় অঞ্চল দখল করে নেয়। এই অবস্থায় ১০৭২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যু হয়। এরপর মহীপাল পাল সিংহাসনে বসেন।

দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭২-১০৭৫) : পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ বিদ্রোহের ফলে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যু ঘটে এবং কৈবর্ত প্রধান দিব্যের হাতে বরেন্দ্রের (উত্তর বাংলা) অধিকারে চলে যায়। বরেন্দ্র বিদ্রোহ সম্পর্কে জানার একমাত্র উৎস হচ্ছে সন্দ্যাকর নন্দীর বিখ্যাত কাব্য রামচরিতম। এ কাব্যের প্রধান বিষয় হলো বরেন্দ্রের পতন এবং রামপাল কর্তৃক তা পুনরুদ্ধার। দ্বিতীয় মহীপাল তাঁর দুই ভাই শূরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করেছিলেন বলে শোনা যায়। কেননা মহীপাল সন্দেহ পোষণ করতেন যে, রামপাল ও শূরপাল রাজ্য ক্ষমতা দখল করে নিতে পারেন।

দ্বিতীয় শূরপাল (১০৭৫-১০৭৭) : তিনি ছিলেন পাল রাজবংশের চতুর্দশতম রাজা। ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাল রাজবংশের ত্রয়োদশতম রাজা দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭২-১০৭৫ খ্রিস্টাব্দ) এর মৃত্যুর পর, তাঁর ভাই শূরপাল রাজত্ব লাভ করেন। ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় শূরপাল নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। উল্লেখ্য প্রথম শূরপাল (৮৫৫-৮৬০) ছিলেন পাল রাজবংশের চতুর্থ রাজা। পাল রাজবংশের দ্বাদশতম রাজা তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৮-১০৭২ খ্রিস্টাব্দ) এর মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল রাজত্ব লাভ করেন। মহীপাল রাজ্যের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। ফলে প্রজা অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে। এরই ভিতরে তিনি কুচক্রীদের পরামর্শক্রমে তাঁর অপর দুই ভাই শূরপাল এবং রামপালকে কারারুদ্ধ করেন। এর ফলে বরেন্দ্র অঞ্চলের সামন্তরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহীপাল এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সামন্তদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। শেষ পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। এই সুযোগে বরেন্দ্র অঞ্চলের উচ্চাভিলাসী দিব্য কৈবর্ত বরেন্দ্র ভূমিতে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় কারারুদ্ধ ছিলেন শূরপাল। দ্বিতীয় মহীপাল এর মৃত্যুর পর শূরপাল মুক্তিলাভ করে রাজত্বলাভ করেন।

রামপাল (১০৮২-১১২৪) : রামপাল পাল বংশের শেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজা। সন্দ্যাকর

নন্দী তাঁর কাব্যগ্রন্থ রামচরিতম এ রামপালের গৌরব কীর্তন করেছেন। বিদ্রোহী কৈবর্তদের কবল থেকে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার তাঁর কৃতিত্ব। এর ফলে বাংলায় পাল শাসন নবজীবন লাভ করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শূরপালের পর পাল সিংহাসনে আরোহণ করে রামপাল পাল সাম্রাজ্যকে বিহারের কিয়দংশ ও পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ দেখতে পান। তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে কৈবর্ত নেতা দিব্য বরেন্দ্র দখল করে নেন এবং তখন থেকেই বরেন্দ্র পালদের হাতছাড়া হয়ে যায়। উত্তর বিহার ছিল কর্ণাটক বংশীয় মিথিলা রাজের শাসনাধীন। বঙ্গের কর্তৃত্ব ছিল বর্মণ বংশের হাতে। বিক্রমপুর ছিল তাদের রাজধানী। পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ বিহারেও রামপালের কর্তৃত্ব ছিল নামে মাত্র, সামন্তরাজাগণ তাঁর প্রতি সামান্যই আনুগত্য প্রদর্শন করতেন।

পাল বংশের দুর্ভাগ্য রামপালের পরবর্তী শাসকগণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। ফলে তাঁদের পক্ষে পাল বংশের হাল শক্ত হাতে ধরা সম্ভব ছিল না। রামপালের পর কুমারপাল (১১২৪-১১২৯), তৃতীয় গোপাল (১১২৯-১১৪৩) ও মদনপাল (১১৪৩-১১৬১) একে একে পাল সিংহাসনে বসেন। এ সময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। অবশেষে দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিজয় সেন পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে বাংলায় সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

সেন বংশের শাসনামল

হেমন্ত সেন (১০৯৭) : হেমন্ত সেন ছিলেন বাংলার হিন্দু সেন রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এবং সেন বংশের মূল প্রতিষ্ঠাতা "সামন্ত সেনের" পুত্র। তবে সামন্ত সেন রাজা উপাধি ধারণ করেন নি। পাল বংশের পতনের পর বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে সেন রাজ বংশের সূচনা হয়। ধারণা করা হয় তাঁরা এদেশে ছিলেন বহিরাগত। তাঁদের পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল সুদূর দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটে। কেহ কেন মনে করেন তাঁরা ছিলেন 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়'। তিনি যৌবনে কর্ণাটে বীরত্ব প্রদর্শন করে শেষ বয়সে প্রথমে বসতি স্থাপন করেন রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে। তিনি কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে। ধারণা করা হয় পাল রাজা রামপালের অধীনে তিনি একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। কিন্তু তার পুত্র হেমন্ত সেন স্বাধীন সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে প্রথম 'মহারাজা' উপাধি ধারণ করেন।

বিজয় সেন (১০৯৭-১১৬০) : বিজয় সেন ছিলেন সেন রাজ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তার পিতা হেমন্ত সেনের প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র সেন রাজ্যকে তিনি পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি ১০৯৭-১১৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। তার প্রতিষ্ঠিত সেন বংশ ১০০ বছর পর্যন্ত টিকে ছিলেন। বিজয় সেনের বংশধরগণ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে এদেশে এসেছিলেন। তিনি শূরবংশীয় রাজকন্যা বিলাশদেবীকে বিয়ে করেছিলেন। বিজয় সেন পাল বংশের শেষ রাজাদের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নেন। এছাড়া উড়িষ্যার শাসক অনন্তবর্মণ এর সাথেও তার সামরিক মৈত্রী চুক্তি হয়েছিল। এই দুইটি বিষয় তাকে সেন সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করে। বিজয় সেন বর্মণ, ভিরা, রাগভ প্রভৃতি রাজ্যবর্গকে পরাজিত করেন। দেওপাড়া শীলালিপি থেকে পাওয়া যায় যে বিজয় সেন কামরূপ ও কলিঙ্গ জয়

করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করেছিলেন। এরপর সম্ভবত উত্তর বিহারের কিছু অংশও অধিকার করে নেন। বিজয় সেন পাল রাজ বংশের শেষ রাজা মদন পালকে তার রাজধানী গৌড় থেকে বিতাড়িত করেন। মদন পাল উত্তর বঙ্গে পলায়ন করেন এবং পরবর্তী আট বছর সেখানে পাল বংশের শাসন কায়েম রাখেন। ১১৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে মদন পালের মৃত্যুর পর বিজয় সেন সমগ্র উত্তরবঙ্গ অধিকার করে নেন। ১২ শতাব্দীতে তিনি বঙ্গ (দক্ষিণ বাংলা) আক্রমণ করেন এবং বর্মণদের রাজধানী বিক্রমপুর অধিকার করে নেন। ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে ৬২ বছরের দীর্ঘ রাজত্বকালের অবসানের পর বিজয় সেন মারা যান।

বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৯) : ১০৬০ সালে রামপাল নগরে বল্লাল সেনের জন্ম হয়। তার পিতা বিজয় সেন গৌড়াধিপতি চন্দ্রসেনের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। শৈব বরে তার জন্ম হওয়ায় বিজয় সেন পুত্রের নাম রাখেন “বরলাল”, পরবর্তীতে “বল্লাল” শব্দটি তারই অপ্রভ্রংশ হয়ে দাঁড়ায়। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি অস্ত্রবিদ্যায় ও শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। তিনি ছিলেন বঙ্গের সেন রাজ বংশের দ্বিতীয় রাজা। ১১৬০-১১৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি সেন বংশের রাজত্ব করেন। কুলজি গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন সেন রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের পুত্র এবং উত্তরসূরী। বল্লাল সেন পশ্চিম চালুক্য সাম্রাজ্যের রাজকুমারী রামদেবীকে বিয়ে করেন, যা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সেনশাসকদের ঘনিষ্ঠ সামাজিক যোগাযোগের ইঙ্গিত বহন করে। তিনি বঙ্গের সামাজিক সংস্কার, বিশেষ করে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনকারী হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত এবং লেখক, দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর তার উল্লেখযোগ্য রচনা। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বৃদ্ধ বয়সে বল্লাল সেন রাজ্যাভার নিজ পুত্র লক্ষ্মণসেনকে অর্পণ করেন। বল্লাল সেন জীবনের শেষ দিনগুলি রামদেবীকে নিয়ে ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গা তীরবর্তী একটি স্থানে অতিবাহিত করেন।

লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৬) : লক্ষ্মণ সেন মধ্যযুগীয় বাংলার সেন রাজ বংশের চতুর্থ রাজা। তিনি ১১৭৯-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন তাঁর পিতা বল্লাল সেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁর রাজত্বকে কামরূপ (বর্তমানে অসম), কলিঙ্গ (বর্তমান উড়িষ্যা), এবং কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ১২০৬ সালে মুহাম্মদ ঘুরি দিল্লিতে তুর্কি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরই মধ্যে ১২০২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সামরিক নেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করেন। এর কিছুদিন আগে লক্ষ্মণ সেন নদীয়ায় অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। নদীয়া তুর্কিদের দ্বারা আক্রান্ত হলে বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন বাধা না দিয়ে নৌকা যোগে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে পালিয়ে যান। এমতাবস্থায় নদীয়া তুর্কি শাসনে চলে যায়। তবে লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গ থেকে শাসন কাজ চালিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র বিশ্বরূপ সেন রাজা হন। বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২০) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বিশ্বরূপ সেনের মৃত্যুর পর কেশব সেন (১২২০-১২৫০) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তবে লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর থেকেই বাংলায় সেন শাসন দুর্বল হতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ত বিদ্রোহের ফলে সেন রাজ্যের পতন ঘটে।

বাংলার মুসলিম শাসনামল

তের শতকের সূচনালগ্নে (১২০৪-০৫) বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। তবে এর অনেক পূর্ব থেকেই বাংলার সাথে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল; অবশ্য সে যোগাযোগের স্বরূপ ছিল বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় এবং তা উপকূলীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। বখতিয়ার খিলজীর সামরিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার জয় করার পর ভারতে মুহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন আইবেকের সাথে বদাউনে গিয়ে সৌজন্যমূলক সাক্ষাত করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তার সৈন্যবাহিনী আরও শক্তিশালী করেন এবং ১২০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিকভাবে বাংলা আক্রমণ করে রাজা লক্ষণ সেনের সাময়িক রাজধানী নদীয়া অধিকার করেন। এখানে অগাধ ধনসম্পদ, অগণিত পরিচারক-পরিচারিকা ও বহুসংখ্যক হাতি বখতিয়ারের হস্তগত হয়। অতপর তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজধানী গৌড় দখল করে সেখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন এবং প্রায় দু'বছরকাল বিজিত রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। প্রশাসনিক বিন্যাস ছাড়াও বখতিয়ার বাংলায় মুসলিম সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নামাযের জন্য মসজিদ, মুসলিম ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য মাদরাসা এবং ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে সুফিদের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

অযোধ্যার মির্জাপুর জেলায় অবস্থিত তাঁর মূল জায়গির ছাড়াও দক্ষিণ বিহার এবং উত্তর বিহারে গঙ্গা নদীর উত্তর তীরবর্তী ভূখণ্ড তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। বাংলা অঞ্চলে রাজমহল, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর জেলাগুলি তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র-করতোয়া নদী লখনৌতি রাজ্যের পূর্ব সীমানা নির্দেশ করে। অতপর তিব্বত অভিযানে বখতিয়ারের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ব্যর্থ অভিযান শেষে চরম হতাশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় দেবকোটে ফিরে এসে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন অথবা আলী মর্দান খিলজী কর্তৃক নিহত হন। তার মৃত্যুর পর শাসন ক্ষমতা নিয়ে চরম বিরোধ দেখা দেয়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে শাসন ক্ষমতা তুলে ধরা হল :

১. ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ১২০৪-১২০৬
২. আলী মরদান ও মুহম্মদ শীরাণের মধ্যে যুদ্ধ ১২০৬-১২০৭
৩. ইজউদ্দীন মুহম্মদ শীরাণ খিলজী ১২০৭-১২০৮
৪. হুসামউদ্দীন আইয়াজ ১২০৮-১২১০
৫. আলীউদ্দীন আলী মরদান ১২১০-১২১৩
৬. হুসামউদ্দীন আইয়াজ (দ্বিতীয়বার) ১২১৩-১২২৭
৭. নাসিরউদ্দীন মামুদ ১২২৭-১২২৯
৮. ইখতিয়ারউদ্দীন বলকা খিলজী ১২২৯-১২৩০
৯. আলাউদ্দীন জানী ১২৩০-১২৩১
১০. সাইফউদ্দীন আইবক ১২৩১-১২৩৬
১১. ইজউদ্দীন তুঘরিলা তুঘান খান ১২৩৬-১২৪৫
১২. কমরউদ্দীন তামার খান কিরান ১২৪৫-১২৪৭

১৩. জালালউদ্দীন মাসুদ শাহ জানী ১২৪৭-১২৫১
১৪. ইখতিয়ারউদ্দীন উজবুক তুঘান খান ১২৫১-১২৫৭
১৫. জালালউদ্দীন মাসুদ শাহ জানী (দ্বিতীয়বার) ১২৫৭-১২৫৮
১৬. ইজউদ্দীন বলবন উজবুক ১২৫৮-১২৫৯
১৭. তাজউদ্দীন আরসালান খান ১২৫৯-১২৬৫
১৮. তাতার খান ১২৬৫-১২৬৮
১৯. শের খান ১২৬৮-১২৭২
২০. আমির খান ১২৭২-১২৭৮
২১. মুঘিসউদ্দীন তুঘরিল ১২৭৮-১২৮৩
২২. নাসিরউদ্দীন বুঘরা খান ১২৮৩-১২৮৭
২৩. বুঘরা খান ১২৮৭-১২৯১
২৪. রুকনউদ্দীন কাইকাযুস ১২৯১-১৩০১
২৫. শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহ ১৩০১-১৩২২
২৬. জালালউদ্দীন মামুদ শাহ ১৩০৭-১৩০৯ (যুক্তশাসন)
২৭. গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ ১৩১০-১৩২২ (যুক্তশাসন)
২৮. শিহাবউদ্দীন বুঘরা শাহ ১৩১৭-১৩১৮ (যুক্তশাসন)
২৯. গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ ১৩২২-১৩২৪
৩০. নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিম শাহ ১৩২৪-১৩২৭
৩১. গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ (দ্বিতীয়বার) ১৩২৭-১৩২৮
৩২. বহরাম তাতার খান ১৩২৮-১৩৩৮ (যুক্তশাসন)
৩৩. কাদির খান ১৩২৮-১৩৩৯ (যুক্তশাসন)
৩৪. ইজউদ্দীন আজম-উল-মুলক ১৩২৮-১৩৩৯ (যুক্তশাসন)
৩৫. আলাউদ্দীন আলী শাহ ১৩৩৯-১৩৪২

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন

ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনামল

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮) : শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ছিলেন বাংলার একজন স্বাধীন শাসনকর্তা। তিনি ১৩৪২ সালে সোনারগাঁও বিজয়ের পর লখনৌতির সুলতান হন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম স্বাধীন সুলতান ছিলেন এবং ইলিয়াস শাহী বংশের সূচনা করেন। ইলিয়াস শাহী বংশ ১৩৪২ সাল থেকে ১৪১৫ সাল পর্যন্ত একটানা ৭৩ বছর ধরে অবিভক্ত বাংলা শাসন করে। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ প্রথম জীবনে দিল্লির সালতানাতের অধীনে চাকরি করতেন। কিন্তু কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণে তিনি বাংলায় পালিয়ে আসেন এবং তৎকালীন বাংলায় দিল্লির প্রাদেশিক গভর্নর ইজাজউদ্দীন ইয়াহিয়ার অধীনে কাজ করা শুরু করেন। ১৩৩৮ সালে ইজাজউদ্দীন ইয়াহিয়ার মৃত্যু হলে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সাতগাঁওয়ের ক্ষমতা দখল করেন এবং একে দিল্লির অধীন থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন। ১৩৪২ সালে প্রায় দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধে লখনৌতির সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহকে পরাজিত করে তিনি লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ইলিয়াস শাহী বংশের সূচনা করেন। এবং এরপর মাঝখানে প্রায় ২০ বছর বাদ দিয়ে

আরো ৫২ বছর তাদের শাসন কয়েম থাকে। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সিকান্দার শাহ ক্ষমতায় আসেন।

সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৯০) : সিকান্দার শাহ ছিলেন বাংলার শাসক ইলিয়াস শাহী রাজবংশের দ্বিতীয় সুলতান। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ তার পিতা ছিলেন। ১৩৫৮ সালে তিনি পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। তার শাসনামলে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা জয়ের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। ফিরোজ শাহ তাকে বাংলার ন্যায়সঙ্গত শাসক বলে ঘোষণা করেন। তার প্ররোচনায় ১৩৫৯ সালে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ৪৭০ হস্তী ও বড় আকারের পদাতিক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনীকে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দেন। পিতার মত সিকান্দার শাহও একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। এতে করে ফিরোজ শাহ প্রাসাদ অবরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত ফিরোজ শাহ বাংলা থেকে তার বাহিনী ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন এবং সিকান্দার শাহর সাথে সন্ধি করেন। সিকান্দার শাহ ও তার প্রথম স্ত্রীর ১৭ জন পুত্র ছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর ছিল ১ জন পুত্র। দ্বিতীয়জন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সোনারগাঁও ও সপ্তগ্রাম দখল করেন। শেষ পর্যন্ত ১৩৯০ সালে রাজধানী পাণ্ডুয়ার কাছে গোয়াল পাড়ার যুদ্ধে তিনি তার পিতাকে পরাজিত ও হত্যা করেন এবং গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ নামধারণ করে সিংহাসনে বসেন।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১১) : গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন প্রথম ইলিয়াস শাহী রাজ বংশের তৃতীয় সুলতান। তিনি তৎকালীন বাংলার সুপরিচিত সুলতানদের অন্যতম ছিলেন। তার প্রকৃত নাম আজম শাহ। সিংহাসন আরোহণের পর তিনি গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ নাম ধারণ করেন। তিনি যুদ্ধের চেয়ে মিত্রতা ও কূটনীতির মাধ্যমে রাজ্যকে সমৃদ্ধ করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি কামরূপের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তবে অঞ্চল জয়ের চেয়ে শাসন সুসংহত করার প্রতি তার মনোনিবেশ বেশি ছিল। জৌনপুরের খাজা জাহানের নিকট তিনি দূত ও উপহার প্রেরণ করেন। সমকালীন চৈনিক সম্রাট ইয়ং লিওর সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ সালে তিনি চীনে দূত প্রেরণ করেন। ইয়ং লিও তার কাছে দূত ও উপহার পাঠান। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মক্কা ও মদিনায় দূত প্রেরণ করেন। এই দুই স্থানে গিয়াসিয়া মাদরাসা নামক দু'টি মাদরাসা নির্মাণে তিনি আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। তার শাসনামলে জমিদার রাজা গণেশ নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ১৪১১ সালে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ জেলায় তার মাজার রয়েছে।

সাইফউদ্দিন হামজা শাহ (১৪১১-১৪১২) : সাইফউদ্দিন হামজা শাহ ছিলেন বাংলার প্রথম ইলিয়াস শাহী রাজ বংশের চতুর্থ সুলতান। তার পিতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহর মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতালাভ করেন এবং সুলতানুস সালাতিন উপাধি ধারণ করেন। হামজা শাহর রাজত্বকালে বাংলায় গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। ১৪১২ সালে তিনি তার দাস শিহাবউদ্দিন কর্তৃক নিহত হন।

মুহাম্মদ শাহ (১৪১২-১৪১৩) : মুহাম্মদ শাহ বিন হামজা শাহ ছিলেন বাংলার প্রথম ইলিয়াস শাহী রাজ বংশের পঞ্চম সুলতান। তিনি তার পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তবে বেশি দিন তিনি রাজ্য পরিচালনা করতে পারেন নি। তিনি দিনাজপুরের জমিদার রাজা গণেশের আদেশে তার পিতার দাস শিহাবউদ্দিন বায়াজিদ শাহ কর্তৃক নিহত।

বায়াজিদ বংশের শাসনামল

শিহাবউদ্দিন বায়াজিদ শাহ (১৪১৩-১৪১৪) : শিহাবউদ্দিন বায়াজিদ শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহী রাজ বংশের সুলতান। তিনি এক বছরের মত সংক্ষিপ্ত সময় সুলতান ছিলেন। তিনি তার পিতা সাইফউদ্দিন হামজা শাহর উত্তরাধিকারী হন। শিহাবউদ্দিন বায়াজিদ শাহ তার পূর্বসূরীদের মত চীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তিনি চীনের সম্রাটের কাছে একটি জিরাফ ও সোনালি পাতার উপর লেখা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ৮১৬ ও ৮১৭ হিজরিতে তিনি মুদ্রা চালু করেন। মুদ্রা সংক্রান্ত কিছু সূত্র মতে, তার উত্তরসূরী পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ৮১৭ হিজরিতে মুদ্রা চালু করেন। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ কাসিম হিন্দুশাহর মতে রাজাগণেশ শিহাবউদ্দিন বায়াজিদ শাহর মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করেন। তবে কেউ বলেন, রাজা গণেশ শিহাবউদ্দিন বায়াজিদ শাহকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন।

প্রথম আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪১৪-১৪১৫) : প্রথম আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ছিলেন সুলতান শিহাবউদ্দিন বায়াজিদ শাহর পুত্র ও উত্তরসূরী। সুলতান হলেও তার ক্ষমতা নামে মাত্র ছিল। দিনাজপুরের জমিদার রাজা গণেশ এসময় মূল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কয়েকমাস শাসন করার পর গণেশ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। ৮১৭ হিজরিতে মুয়াজ্জামাবাদ (পূর্ব বাংলা) ও সাতগাঁও (দক্ষিণ বাংলা) থেকে জারি করা প্রথম আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহর মুদ্রা পাওয়া গেলেও রাজধানী ফিরোজাবাদ (পান্ডুয়া) থেকে জারি করা মুদ্রা পাওয়া যায়নি। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি রাজধানী ত্যাগ করে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু গণেশ তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন।

রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৫ এবং ১৪১৬-১৪১৮) : রাজা গণেশ ছিলেন বাংলার একজন হিন্দু শাসক। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার ভাতুরিয়ায়। তিনি বাংলার ইলিয়াস শাহী রাজ বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় আসেন। মধ্যযুগের ইন্দো-পারসিয়ান ইতিহাসবিদরা তাকে একজন কাফির দখলদার বলে অভিহিত করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশ ১৪১৫-১৪৩৫ সময়কালে বাংলা শাসন করে। তার পুত্র সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহর মুদ্রায় তার নাম কানস রাউ বা কানস শাহ বলে উল্লেখ রয়েছে। তিনি ১৪১৪-১৪১৫ এবং ১৪১৬-১৪১৮ এ দুই দফায় শাসন পরিচালনা করেন। ঠাকুরগাঁও এ এখনো রাজা গণেশের গড় বিরাজমান। রাজা গণেশ ভাতুরিয়ার জমিদার ছিলেন এবং ফ্রান্সিস বুচানন হ্যামিল্টনের মতে তিনি উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের হাকিম ছিলেন।

জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪১৬ এবং ১৪১৮-১৪৩৩) : জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (মূল নাম যদু) ছিলেন রাজা গণেশের পুত্র ও উত্তরসূরী। ১৪১৫-১৪১৬ এবং ১৪১৮-১৪৩৩ এই দুই দফায় তিনি বাংলা শাসন করেন। কুতুবুল আলমের

কাছে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দফা শাসনের সময় তিনি সুলতান, আমির ও খলিফাতুল্লাহ উপাধি ধারণ করেন।

শামসুদ্দিন আহমদ শাহ (১৪৩৩-১৪৩৫) : শামসুদ্দিন আহমাদ শাহ ছিলেন সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৪ বছর বয়সে তিনি ক্ষমতালাভ করেন। আহমাদ শাহ মাত্র ৩ বছর শাসন করেন। তাঁর শাসনামলে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়। তিনি পিতার উদারনীতি বজায় রাখেন এবং ন্যায়বিচার ও দানশীলতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তার শাসনামলে ইবরাহিম শাহ শারকি আগ্রাসন চালান। পরবর্তীতে আহমাদ শাহ দুজন ক্ষমতাশালী অভিজাত সাদি খান ও নাসির খান কর্তৃক ১৪৩৬ সালে নিহত হন। তার হত্যাকাণ্ডের পর সাদি খান ও নাসির খান পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়েন এবং দু'জনে ক্ষমতা হারান। ইলিয়াস শাহী রাজ বংশের একজন বংশধর ১৪৩৭ সালে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৫-১৪৫৯) : নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ ছিলেন বাংলার সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের বংশধর। ১৪৩৫ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর মাহমুদ শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তার ক্ষমতা গ্রহণ থেকে ২০ বছরের মধ্যে তার রাজ বংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়। খান জাহান আলীর সহযোগিতায় তিনি বাংলার বিভিন্ন অংশে মুসলমানদের বসতি স্থাপনে সাহায্য করেন। তারা মসজিদ, পানি উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন ধরনের খনন যেমন, খাল, কূপসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক স্থাপনা নির্মাণ করেন। তার রাজত্বের সময়কালের কিছু উল্লেখযোগ্য মসজিদ হল, (ক) ষাট গম্বুজ মসজিদ- খান জাহান আলী কর্তৃক স্থাপিত হয় (খ) ১৪৪৩ সালে জঙ্গিপুরের সরফরাজ খান মুর্শিদাবাদ জেলায় দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন (গ) ১৪৫৫ সালে গৌড়তে হিলালি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন (ঘ) ১৪৫৫ সালে ঢাকায় বখত বিনাত বিবি নামে একজন মহিলা একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা বিনাতি বিবির মসজিদ নামে পরিচিত (ঙ) ১৪৪৬ সালে ভাগলপুরে খুর্শিদ খান একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এছাড়াও বাগেরহাটে খান জাহান আলীর মাজার ও আল্লামা হযরত পানদুয়ার মাজার তার সময়কালেই নির্মাণ করা হয়। তিনি নিজে গৌড়তে নগরদুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এগুলো ছাড়াও পাথরের পাঁচ তীরুদাজ সেতু যা দুর্গের প্রধান বেষ্টনির অংশ ও কতোয়ালী দরজা তিনিই নির্মাণ করেন। তার রাজত্বের সময় খান জাহান আলী, খুলনা ও যশোর জয় করেন। বিভিন্ন যুদ্ধে পাওয়া তথ্য মতে, নাসিরুদ্দিনের রাজ্য ভাগলপুর থেকে পশ্চিমে, পূর্ব থেকে ময়মনসিংহ ও সিলেট, উত্তরে গৌড় ও পাড়ুয়া এবং দক্ষিণে হুগলি পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) : রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ ছিলেন সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। বারবাক শাহ তার পিতার শাসনামলে সপ্তগ্রামের গভর্নর নিযুক্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর ১৪৫৯ সালে তিনি ক্ষমতালাভ করেন। বারবাক শাহের শাসনামলে কলিঙ্গের গজপতি রাজ্যের (বর্তমান উড়িষ্যা) রাজা দক্ষিণ বঙ্গ আক্রমণ করেন এবং মান্দারান দুর্গ দখল করেন। বারবাক

শাহ তার সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজিকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইসমাইল গাজি কলিঙ্গের সেনাদের পরাজিত করে দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। তবে ইসমাইল গাজির গৌরব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। গুজব ছড়ায় যে তিনি কামেশ্বরের সাথে পরিকল্পনা করে নিজের জন্য কামরূপে একটি স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। ইসমাইল গাজিকে হত্যা করা হয় এবং তার মৃতদেহ দুটি ভিন্ন স্থানে দাফন করা হয়। কামরূপের রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বারবাক শাহের অধীনতা স্বীকার করেন। কামরূপ অভিযানের মাধ্যমে তার শাসিত এলাকা উত্তরে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৪৬৮ সালে তিনি হাজিগঞ্জ দুর্গ ও তিরহুতের চারপাশের এলাকা আক্রমণ করেন। এই বিজয় বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত তার রাজ্যের সীমানা বিস্তারলাভ করে। সিলেট, বাকেরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম বারবাক শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অতপর ১৪৭৪ সালে তিনি মারা যান।

শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১) : শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ ছিলেন সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহের পুত্র ও উত্তরসূরী। ১৪৭৪ সালে তিনি ক্ষমতালাভ করেন এবং শামসুদ্দীন আবুল মুজাফফর ইউসুফ শাহ নাম গ্রহণ করেন। তার শাসনামলে তিনি “খলিফাতুল্লাহ বিল হুজ্জাত ওয়াল বুরহান, সুলতানুল সালাতিন, জিল্লুল্লাহ ফিল আলামিন ও খলিফাতুল্লাহ ফিল আরদিন” উপাধি ধারণ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবি জয়নুদ্দিন তার রাসুল বিজয় গ্রন্থ সম্পন্ন করেন। তার শাসনামলে বেশ কিছু মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মসজিদটি হল মালদার সাকোমোহন মসজিদ, তান্তিপাড়া মসজিদ, কদম রসুল মসজিদ ও গোড়ের দরাসবারি মসজিদ। নিজ রাজ্যে শরিয়া আইন প্রয়োগ করেন এবং মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। ১৪৮১ সালে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় সিকান্দর শাহ (১৪৮১) : দ্বিতীয় সিকান্দর শাহ ১৪৮১ সালে সংক্ষিপ্ত সময় বাংলার সুলতান ছিলেন। সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের পুত্র সিকান্দর শাহ পিতার মৃত্যুর পর ক্ষমতালাভ করেন। তবে তিনি বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেন নি। ইতিহাসবিদ গোলাম হোসেন ও নিজামউদ্দিন আহমাদের মতে তিনি এক বা দুইদিনের জন্য সুলতান ছিলেন। বাংলাপিড়িয়া অনুযায়ী, মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য তাকে সরে দাঁড়াতে হয়। তবে সুলতান হিসেবে তার সময়সীমা দুই মাস পর্যন্ত হতে পারে।

জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১- ১৪৮৭) : জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহী রাজ বংশের শেষ সুলতান। তিনি সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের ভাই ছিলেন। ফতেহ শাহ কর্তৃক পরিচালিত কোনো সামরিক অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে মুদ্রা সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, তার রাজ্য পূর্বে সিলেট ও দক্ষিণ পশ্চিমে দামোদর নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার শাসনামলে হাবশিরা দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী অবস্থান লাভ করে। ফতেহ শাহ নিয়ন্ত্রণ পুণরায় লাভ করার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয় ও পরবর্তীতে ১৪৮৭ সালে হাবশি প্রাসাদ রক্ষীদের প্রধান তাকে হত্যা করে। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সমাপ্তি হয়।

হাবসি বংশের শাসনামল

শাহজাদা বারবাক (১৪৮৭) : শাহজাদা বারবাক বঙ্গে হাবশি রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ এর রাজত্বে তাঁর প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। ইলিয়াস বংশের শাসক জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ-এর রাজত্বে ইখিওপীয়রা (হাবশি) রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। জালালউদ্দিন তাঁর অধিকার পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। কিন্তু প্রাসাদ রক্ষীদের সর্বাধিনায়ক বারবাক তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অনতিবিলম্বে জালালউদ্দিনকে হত্যা করা হয়। শাহজাদা বারবাক ক্ষমতা দখল করেন এবং সুলতান শাহজাদা নাম নিয়ে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু বারবাকের রাজত্ব ছিল অতি ক্ষণস্থায়ী। অভিষেকের বছরেই সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ নামক ইলিয়াস বংশের একজন ভূতপূর্ব সেনাপতি তাকে হত্যা করেন। সাইফউদ্দিন নিজেও জাতিগতভাবে হাবশি ছিলেন।

সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-১৪৯০) : সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ ছিলেন বাংলার হাবশি রাজ বংশের দ্বিতীয় সুলতান। তার মূল নাম মালিক ইনদিল। তিনি আবিসিনিয়দের বংশধর ছিলেন। ইলিয়াস শাহী রাজবংশের তিনি একজন সেনা অধিনায়ক ছিলেন। ১৪৮৭ সালে হাবশি রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহজাদা বারবাক নিহত হওয়ার পর সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ ক্ষমতালাভ করেন। শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ কর্তৃক ১৪৯০সালে তিনি নিহত হন।

দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৯০) : দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ ছিলেন বাংলার একজন সুলতান। তিনি শৈশবে সুলতান হন। হাবশ খান এসময় প্রকৃতপক্ষে শাসক ছিলেন। শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ কর্তৃক ১৪৯০ সালে তিনি নিহত হন।

শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ (১৪৯০-১৪৯৪) : শামসুদ্দিন মোজাফফর শাহ ছিলেন বাংলার একজন হাবশি সুলতান। তার মূল নাম ছিল সিদি বদর। তিনি প্রথমে বালক সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ শাহের অভিভাবক হাবাশ খান ও পরে সুলতানকে হত্যা করেন। তিনি শামসুদ্দিন মোজাফফর শাহ উপাধি গ্রহণ করে ক্ষমতারোহণ করেন। ১৪৯৪ সালে তার উজির সাইদ হুসাইনের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। উজির আলাউদ্দিন হোসেনশাহ নাম গ্রহণ করে ক্ষমতারোহণ করেন। ইন্দো-পারসিয়ান ইতিহাসবিদরা তাকে একজন অত্যাচারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার অত্যাচার অভিজাত ও সাধারণ প্রজাদের শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছিল।

হুসেন বংশের শাসনামল

আলাউদ্দিন হুসেনশাহ (১৪৯৪-১৫১৯) : আলাউদ্দিন হুসেনশাহ ছিলেন মধ্যযুগে বাংলার স্বাধীন সুলতান। তিনি হুসেনশাহী রাজ বংশের পত্তন করেন। হাবশি সুলতান শামসুদ্দিন মোজাফফর শাহ নিহত হওয়ার পর তিনি বাংলার সুলতান হন। ইতিপূর্বে তিনি মোজাফফর শাহের উজির ছিলেন। ক্ষমতালাভ করার পর গৌড়ে লুটপাট থেকে ফিরে আসার আদেশ দেন। কিন্তু তারা তা অব্যাহত রাখলে তিনি বার হাজার সৈনিককে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং লুট হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন। এর মধ্যে ১৩,০০০ স্বর্ণের প্লেট ছিল। এরপর তিনি প্রাসাদ রক্ষীদের দলকে বিলুপ্ত করেন। কেননা প্রাসাদের ভেতর এরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল। প্রশাসন থেকে তিনি হাবশিদের সরিয়ে দেন এবং তাদের স্থলে তুর্কি, আরব, আফগান ও স্থানীয় লোকদের

নিয়োগ দেন। তার শাসনামল জুড়ে বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। তিনি ২৫ বছর শাসন করেন। তার শাসনামলে শান্তি বজায় ছিল। হিন্দু প্রজাদের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি তার আমলের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ১৫১৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার পুত্র নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ ক্ষমতালাভ করেন।

নাসিরউদ্দীন নুসরাত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) : নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পুত্র। তিনি তার পিতার অনুসৃত নীতি বজায় রাখেন। শাসনের প্রথমদিকে নতুন নতুন অঞ্চল জয় করে সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করলেও ১৫২৬ সালের পর তাকে মোগলদের সাথে জড়িয়ে পড়তে হয়। অহোম রাজ্যের কারণেও তাকে কষ্টকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।

দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-১৫৩৩) : দ্বিতীয় আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ছিলেন সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তার শাসনামলে আসামের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। বাংলার সেনারা আসামে প্রবেশ করে ও কালিয়াবোর পৌছে যায়। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরও যুদ্ধ চলতে থাকে। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ তার পিতৃব্য গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ কর্তৃক নিহত হন।

গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮) : গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ছিলেন হুসেন শাহী রাজ বংশের সর্বশেষ সুলতান। ১৪৯৪ সালে আলাউদ্দিন হুসেনশাহ এই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাপিড়িয়া তাকে একজন “দুর্বল, বিলাসিতা প্রবণ ও সহজসরল শাসক” হিসেবে উল্লেখ করেছে। এই বর্ণনা অনুযায়ী তার কূটনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ছিল এবং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিতেও তিনি ব্যর্থ ছিলেন। তার শাসনকালকে বিদ্রোহের কারণে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে তার সেনাপতি ও চট্টগ্রামের গভর্নর খোদা বখশ খান ও হাজিপুরের গভর্নর মাখদুম খানের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। তার শাসনামলে ১৫৩৪ সালে পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম আসেন। অন্যায় আচরণের অভিযোগে তাদের বন্দী করে গৌড়ে পাঠানো হয়। কিন্তু সুলতান তাদের বিবেচনা করে চট্টগ্রাম ও হুগলিতে কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেন। গিয়াসউদ্দিন ও তার পর্তুগিজ মিত্ররা ১৫৩৮ সালের ৬ এপ্রিল শের শাহ শূরির কাছে পরাজিত হন।

শূরি বংশের শাসনামল

শের শাহ শূরি (১৫৪০-১৫৪৫) : শের শাহ শূরি ছিলেন মধ্যযুগীয় দিল্লির একজন শক্তিশালী আফগান (পাশতুন) বিজয়ী। একজন সাধারণ সেনা কর্মচারী হয়ে নিজের কর্মজীবন শুরু করে পরবর্তীকালে তিনি মুঘল সম্রাট বাবরের সেনাবাহিনীর সেনানায় শের পদে উত্তীর্ণ হন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ১৫৩৭ সালে নতুন মুঘল সম্রাট হুমায়ুন যখন অন্যত্র অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় শের শাহ শূরি বাংলা জয় করে শূরি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেকে নতুন সম্রাট ঘোষণা করেন। শের শাহ শূরি কেবলমাত্র একজন মেধাবী রণকৌশলবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক ও যোগ্য সেনানায়ক। ১৫৪০ থেকে ১৫৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর পাঁচ বছরের স্বল্পকালীন রাজত্বে তিনি নাগরিক ও সামরিক প্রশাসনের এক নতুন ধারার সূচনা ঘটিয়ে ছিলেন। তিনিই প্রথম রূপিয়া

নামক মুদার প্রচলন করেন। তাছাড়া তিনি ডাক ব্যবস্থারও আমূল সংস্কার করেন। তিনি হুমায়ূনের দিনা-পানাহ শহরের উন্নতি ঘটান এবং এর নতুন নামকরণ করেন শেরগড়। কথিত আছে, তিনি কোনো এক ভারতীয় জঙ্গলে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘকে সম্পূর্ণ খালি হাতে হত্যা করেছিলেন। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড (সড়ক-এ-আজম) শের শাহ শুরির অমর কীর্তি। বিগত চার শতাব্দী ধরে এই সড়ক “বিশ্বে অদ্বিতীয় এক জীবননদীর মতো” দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৫৪৫ সালে চান্দেল রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কালিঞ্জর দূর্গে বারুদের বিস্ফোরণে শের শাহ শুরির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ শুরি নাম গ্রহণ করে শুরি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন।

ইসলাম শাহ শুরি (১৫৪৫-১৫৫৩) : ইসলাম শাহ শুরি গুর সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শাসক। ইসলাম শাহ শুরির আসল নাম ছিল জালাল খান এবং তিনি শের শাহ শুরির পুত্র ছিলেন। ইসলাম শাহ শুরি সাত বছর (১৫৪৫-১৫৫৩) শাসন করেছেন। তাঁর বার বছরের পুত্র ফিরোজ শাহ শুরি তাঁর উত্তরসূরী হন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ মুবারিজ খান তাকে গুপ্তহত্যা করে। পরবর্তীতে মুহাম্মদ মুবারিজ খান মুহাম্মদ শাহ আদিল নামে শাসন করেছেন।

ফিরোজ শাহ শুরি (১৫৫৩) : ফিরোজ শাহ শুরি গুর সাম্রাজ্যের তৃতীয় শাসক ছিলেন। তিনি ইসলাম শাহ শুরির পুত্র এ বংশের শাহ শুরির দৌহিত্র ছিলেন। তিনি মাত্র বার বছর বয়সে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই শের শাহ শুরির ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ মুবারিজ খান (যিনি পরবর্তীতে মুহাম্মদ শাহ আদিল নামে রাজ্য শাসন করেন) দ্বারা গুপ্তহত্যার শিকার হন।

আদিল শাহ শুরি (১৫৫৩-১৫৫৭) : মুহাম্মদ শাহ আদিল গুর সাম্রাজ্যের চতুর্থ শাসক ছিলেন। মুহাম্মদ শাহ আদিলের আসল নাম হল মুহাম্মদ মুবারিজ খান এবং তিনি শের শাহ শুরির ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ শুরিকে গুপ্তহত্যা করে তিনি গুর সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। ফিরোজ শাহ শুরি শের শাহ শুরির দৌহিত্র ছিলেন, যার বয়স ছিল মাত্র বার বছর। তার উত্তরাধিকারী হিসেবে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন ইব্রাহিম শাহ শুরি। তাঁর শাসনকালে ১৫৫৫ সালে বাংলার শাসক মুহাম্মদ খান শুরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং “শামসুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ” উপাধি ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন।

ইব্রাহিম শাহ শুরি (১৫৫৫) : তিনি গুর সাম্রাজ্যের পঞ্চম শাসক ছিলেন। তার উত্তরাধিকার ছিলেন আহমেদ খান যিনি পরবর্তীতে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার শাহ শুরি নামে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

সিকান্দার শাহ শুরি (১৫৫৫) : তিনি গুর সাম্রাজ্যের ষষ্ঠ শাসক ছিলেন। সিকান্দার শাহ শুরির আসল নাম ছিল আহমেদ খান। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন তাকে পরাজিত করে পুনরায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি উত্তর পাঞ্জাবের সিওয়ালিক পর্বতে পালিয়ে যান। সিকান্দার শাহ শুরি এবং তার ভাই আদিল শাহ শুরি মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং পরাজিত হয়েছিলেন।

আদিল শাহ শুরি দ্বিতীয় (১৫৫৫) : তিনি গুর সাম্রাজ্যের সপ্তম শাসক। তিনি

সিকান্দার শাহ শূরির ভাই ছিলেন, ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুনের কাছে সিকান্দার শাহ শূরি পরাজিত হলে যিনি দিল্লীর পূর্বাঞ্চল শাসন করছেন তিনি এবং সেকান্দার শাহ শূরি দিল্লীর সিংহাসনে বসার জন্য মুঘল সম্রাট আকবরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। আদিল শাহের রাজত্বের কিছু দিনের মধ্যেই, তিনি আবার বঙ্গের শাসক মুহাম্মদ শাহের সঙ্গে কঠোর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিক্রম খানের নেতৃত্বে আকবরের মুঘল সেনারা পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে দিল্লী থেকে ৫০ মাইল উত্তরে সংখ্যায় বিশাল হেমুর শক্তিশালী বাহিনীকে পরাজিত করে, হেমুর চোখে ঘটনাচক্রে তীর বিদ্ধ হলে, তাকে অচেতন অবস্থায় আকবরের কাছে নিয়ে আসা হয় এবং পরে তার শিরচ্ছেদ করা হয়।

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৫৫৫) : মুহাম্মদ খান শূর (শামসুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নামেও পরিচিত) দিল্লীর সুলতান ইসলাম শাহ শূরির অধীনে বাংলার গভর্নর ছিলেন। কিন্তু ১৫৫৪ সালে সুলতানের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং শামসুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নামধারণ করেন। মুহাম্মদ খান শূর আরাকান জয় করেন। উত্তর ভারতে ক্ষমতার জন্য তিনি প্রচেষ্টা চালান। ১৫৫৫ সালে ইসলাম শাহের উত্তরসূরী আদিল শাহের সাথে যুদ্ধ জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধে তিনি আদিল শাহের সেনাপতি হিমু কর্তৃক পরাজিত হন ও নিহত হন। এরপর আদিল শাহ শাহবাজ খানকে বাংলার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন।

প্রথম গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (১৫৫৫-১৫৬০) : শামসুদ্দীন শাহের পুত্র খিজির খান শাহবাজ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রথম গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করে ১৫৫৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৫৫৫-১৫৬০ প্রায় ছয় বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

গিয়াসুদ্দীন জালাল শাহ (১৫৬০-১৫৬২) : গিয়াসউদ্দিন জালাল শাহ (শাসনকাল ১৫৬০-১৫৬২) ছিলেন বাংলার সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের ভাই ও উত্তরাধিকারী। ১৫৬৩ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মোট ৩ বছর তিনি বাংলার শাসক ছিলেন।

দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ (১৫৬২-১৫৬৩) : দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ (খিজির খান শূরি বলেও পরিচিত) বাংলার স্বাধীন সুলতান ছিলেন। তিনি ছিলেন সুলতান শামসুদ্দীন মাহমুদ শাহের পুত্র। বাহাদুর শাহ তৎকালীন গভর্নর শাহবাজ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা লাভ করেন। বাহাদুর শাহ ১৫৫৭ সালে মুহাম্মদ আদিল শাহকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে বাহাদুর শাহ জৌনপুর দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু মুঘল সেনাবাহিনীর কাছে তিনি পরাস্ত হন।

তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন শাহ (১৫৬৩-১৫৬৪) : তিনি ছিলেন বাংলার মুহাম্মদ শাহী রাজ বংশের শেষ সুলতান। ১৫৬২ সালের শুরুতে আফগানের কররানি রাজবংশ বাংলার বড় এলাকা জয় করে নেয়। ১৫৬৪ নাগাদ তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন শাহ তাজ খান কররানি কর্তৃক নিহত হন। ফলে মুহাম্মদ শাহী রাজ বংশের সমাপ্তি ঘটে। এরপর কররানি রাজ বংশের সূচনা হয়।

কররানি বংশের শাসনামল

তাজ খান কররানী (১৫৬৪-১৫৬৬) : তাজ খান কররানী ছিলেন বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহারের অংশ বিশেষ শাসনকারী আফগান বংশোদ্ভূত কররানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাজ খান পূর্বে আফগান সম্রাট শের শাহ শূরির অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি দক্ষিণ পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বাংলার বড় এলাকা দখল করেন। তিনি বাংলার তৎকালীন সুলতানকে হত্যা করেন ও বাংলার নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। তাজ খানের ছোট ভাই সুলায়মান খান কররানী তার উত্তরসূরী হন।

সুলায়মান কররানী (১৫৬৬-১৫৭২) : সুলায়মান খান কররানী ছিলেন বাংলার সুলতান। তার বড় ভাই তাজ খান কররানীর মৃত্যুর পর তিনি সুলতান হন। তিনি গৌড় থেকে তাড়াই রাজধানী সরিয়ে আনেন। সুলায়মান খান, তার ভাই তাজ খান কররানী ও সুলায়মান খানের দুই পুত্র বায়েজিদ খান কররানী ও দাউদ খান কররানী মোগলদের অনুগত একটি স্বল্পস্থায়ী রাজ্য শাসন করেন। আকবরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন পূর্বক সুলায়মান খান অত্র এলাকায় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। মসজিদে আকবরের নামে জুমার খুতবা পাঠের মাধ্যমে তিনি আকবরকে বাংলার সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে মেনে নেন। সুলায়মান খান কররানী একজন ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। পুরনো মালদার সোনা মসজিদ তিনি নির্মাণ করেন। জানা যায় সুলায়মান খান প্রতিদিন সকালে ১৫০ জন আলেমের সাথে ধর্মীয় আলাপ করতেন। এরপরই তিনি অন্যান্য বৈষয়িক বিষয়ে মনোনিবেশ করতেন। সুলায়মান কররানী ৭ বছর শাসন করার পর ১৫৭২ সালের ১১ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র বায়াজিদ খান কররানী এরপর সুলতান হন।

বায়াজিদ খান কররানী (১৫৭২-১৫৭৩) : বায়াজিদ খান কররানী ছিলেন কররানী রাজবংশের তৃতীয় শাসক। তার পিতা সুলায়মান খান কররানীর মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতালাভ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি মোগলদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি কয়েকমাস পর্যন্ত শাসন করেন। এরপর তার আত্মীয় হানসু তাকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে সুলায়মান খানের বিশ্বস্ত অভিজাতরা হানসুর আধিপত্য খর্ব করেন। বায়াজিদ খানের ছোট ভাই দাউদ খান কররানী এরপর ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

দাউদ খান কররানী (১৫৭৩-১৫৭৬) : দাউদ খান কররানী ছিলেন সুলায়মান খান কররানীর কনিষ্ঠ পুত্র। দাউদ খান বাংলা সালতানাত নিয়ে সম্বৃষ্ট ছিলেন না। তিনি শের শাহ শূরির মত উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং সমগ্র ভারত উপমহাদেশ জয়ের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের সাথে তার শত্রুতা সৃষ্টি হয়। পিতার রাজত্বকালে তিনি ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ৩,৬০০ হাতি, ১১,৪০,০০০ পদাতিক ও ২০,০০০ কামানের এক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি বর্তমান ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল আক্রমণ করেন। রাজমহলের যুদ্ধে আকবর খান জাহান কুলির অধীনে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি তেলিয়াগড়ি দখল করে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন। দুই বাহিনী রাজমহলের যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি হলে অনেক দিন চলতে থাকে। বিহারের গভর্নর মোজাফফর খান তুরবাতি ও অন্যান্য সেনাপতিদের আকবর তাদের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে দাউদ খানের পাশে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আফগান নেতা, জুনায়েদ, কুতলু খান ও কালাপাহাড় ছিলেন। ভয়াবহ যুদ্ধের পর ১৫৭৬

সালের ১২ জুলাই দাউদ খান চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও নিহত হন। তার মৃত্যুর পর বাংলা সরাসরি মোঘলদের অধীনে চলে আসে। এরপর থেকে বাংলা একজন সুবেদারের অধীনে শাসিত হতে থাকে।

মুঘল বাংলার সুবাদার শাসনামল

১. মুজাফফর খান ১৫৭৯-১৫৮০
২. খান-ই-আযম ১৫৮০-১৫৮৩
৩. শাহবাজ খান ১৫৮৩-১৫৮৪
৪. সাদিক খান ১৫৮৪-১৫৮৬
৫. উজীর খান ১৫৮৬-১৫৮৭
৬. সায়েদ খান ১৫৮৭-১৫৯৪
৭. মানসিংহ ১৫৯৪-১৬০৫
৮. কুতুবউদ্দীন ১৬০৫-১৬০৭
৯. জাহাঙ্গীর কুলী খান ১৬০৭- ১৬০৮
১০. ইসলাম খান ১৬০৮-১৬১৩
১১. কাসিম খান চিশতী ১৬১৩-১৬১৭
১২. ইব্রাহীম খান ফতেহ ১৬১৭-১৬২৪
১৩. দারাব খান ১৬২৪-১৬২৫
১৪. মহব্বত খান ১৬২৫-১৬২৬
১৫. মুকাররম খান ১৬২৬-১৬২৭
১৬. ফিদাই খান ১৬২৭-১৬২৮
১৭. কাসিম খান জয়িনী ১৬২৮-১৬৩২
১৮. আজম খান ১৬৩২-১৬৩৫
১৯. ইসলাম খান মাসহাদী ১৬৩৫-১৬৩৯
২০. মুহাম্মদ সুজা ১৬৩৯-১৬৬০
২১. মীর জুমলা ১৬৬০-১৬৬৩
২২. শায়েস্তা খান ১৬৬৩- ১৬৭৮
২৩. আযম খান রুকাকো ১৬৭৮-১৬৭৮
২৪. মুহাম্মদ আযম ১৬৭৮-১৬৭৯
২৫. শায়েস্তা খান (দ্বিতীয়বার) ১৬৭৯-১৬৮৮
২৬. খান জাহান বাহাদুর ১৬৮৮-১৬৮৯
২৭. ইব্রাহীম খান ১৬৮৯-১৬৯৭
২৮. আজিমুদ্দীন ১৬৯৭-১৭১২

বাংলায় নবাব শাসনামল

মুর্শিদ কুলি জাফর খান (১৭০৩-১৭২৭) : মুর্শিদ কুলি খান ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব। এছাড়াও বিভিন্ন নথি-পত্র নির্দেশ করে তিনিই মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পরবর্তী প্রথম স্বাধীন নবাব। তাঁর উপর মুঘল সাম্রাজ্যের নামে মাত্র আধিপত্য ছিল, সকল ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই তিনি বাংলার নবাব ছিলেন। জানা যায়, মুর্শিদ কুলি খানকে, হাজি শফি ইসফাহানি নামে ইরানের একজন উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মকর্তা

ক্রীতদাস হিসেবে ক্রয় করেন এবং ইসফাহানিই তাকে শিক্ষিত করে তুলেন। ভারতে ফেরার পর তিনি মুঘল সাম্রাজ্যে যোগদান করেন। ১৭১৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে কার্তালাব খান নামে ইসলাম ধর্মে স্থানান্তরিত করেন ও বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান (১৭২৭-১৭৩৯) : সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান ছিলেন বাংলার একজন নবাব। তিনি মুর্শিদ কুলি খানের কন্যা জয়নব উন-নিসা বেগম ও আজমত উন-নিসা বেগমকে বিয়ে করেছিলেন। তার তৃতীয় স্ত্রীর নাম দুরদানা বেগম সাবিহা। ৩০ শে জুন ১৭২৭ সালে তার শ্বশুর মুর্শিদ কুলি খানের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সরাসরি উত্তরাধিকারী না থাকায় মুর্শিদ কুলি খান তার নাতি সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খানকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করেন। মুর্শিদ কুলি খান ১৭২৭ সালে মৃত্যুবরণ করলে সরফরাজ খান সিংহাসন লাভের উপক্রম হয়।

এদিকে সুজাউদ্দিন ছিলেন উড়িষ্যার সুবেদার ও তার ডেপুটি ছিলেন আলীবর্দী খাঁ। মুর্শিদ কুলি খান সাধারণত সুজাউদ্দিনের জনগণের জন্য গৃহীত সর্বব্যাপী নীতিকে সমর্থন করতেন না। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন সরফরাজ খানকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয় তখন সুজাউদ্দিন নিজ পুত্রের অধীনে চাকরি করতে বিরক্ত ছিলেন। আলীবর্দী খাঁ ও তার ভাই হজি, সুজাউদ্দিনকে বলেন, এই পদের জন্য আপনিই সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। আলীবর্দী খাঁ ও হজির সাহায্যে সুজাউদ্দিন সিংহাসন দখলের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ১৭২৭ সালের আগস্টের দিকে সুজাউদ্দিন পরিপূর্ণভাবে সিংহাসন লাভ করেন ও বাংলার দ্বিতীয় নবাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। সুজাউদ্দিনকে সমর্থন করার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি মুঘল সম্রাটের কাছে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন পাঠান। মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ পরিবর্তে তাকে মুতামুল মুলক (দেশের কর্তা), সুজা-উদ-দৌলা (রাষ্ট্রের নায়ক) ও আসাদ জং (যুদ্ধের সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়াও মুঘল সম্রাট তাকে বিভিন্ন দামি উপঢৌকন দিয়ে সম্মান জানান। ২৬ আগস্ট ১৭৩৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। তাকে মুর্শিদাবাদের রোশনিবাগে সমাধিস্থ করা হয়। তার মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ খান সিংহাসনে বসেন এবং এ সময়ই নাদের শাহ দিল্লি আক্রমণ করেন।

সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০) : সরফরাজ খান ছিলেন বাংলার একজন নবাব। তার আসল নাম মির্জা আসাদুল্লাহ। সরফরাজ খানের নানা নবাব মুর্শিদ কুলি খান সরফরাজকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বা তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১৭২৭ সালে মুর্শিদ কুলি খানের মৃত্যুর পর যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন তখন জানতে পারেন তার পিতা উড়িষ্যার সুবেদার সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান ও তার ডেপুটি আলীবর্দী খাঁ বিশাল বাহিনী নিয়ে সিংহাসন দখলের জন্য মুর্শিদাবাদ অগ্রসর হচ্ছে। সিংহাসনে বসার পর তিনি আলাউদ্দিন হায়দার জং উপাধি ধারণ করেন। তার প্রতিপক্ষ সুবেদার আলীবর্দী তাকে সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করেন। যুদ্ধটি ক্ষণস্থায়ী ছিল কিন্তু এর ভয়াবহতা ছিল মারাত্মক। যুদ্ধের প্রথম দিকেই সরফরাজ খান গুলিবিদ্ধ হন কিন্তু তার সেনাবাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আলীবর্দী খানের নিপুণ রণকৌশলের কাছে সরফরাজের সেনাবাহিনী পরাজিত

হয়। সরফরাজ খান ভাগীরথী নদীর তীরে গিরকার যুদ্ধে নিহত হন। তিনি মৃত্যুর সময় পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা রেখে যান যারা কখনো ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারেন নি। আলীবর্দী খাঁ বাংলার নবাব হিসেবে অভিষিক্ত হন ও একই সাথে মুর্শিদ কুলির নাসিরি রাজ বংশের পতন ঘটে। আলীবর্দী খাঁ আফসার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সরফরাজ খানকে মুর্শিদাবাদের নাগিনাবাগে সমাধিস্থ করা হয়।

নবাব আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০-১৭৫৬) : নবাব আলীবর্দী খাঁ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মাতামহ। আলীবর্দী খাঁ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। তার পূর্ণ নাম মির্জা মুহাম্মদ আলী। তার পিতার নাম মির্জা মুহাম্মাদ। আরব বংশোদ্ভূত মির্জা মুহাম্মদ আজম শাহের (আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র) দরবারের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। আলীবর্দী খাঁর মা খুরাসানের এক তুর্কি উপজাতি হতে এসেছিলেন। তার পিতামহ আওরঙ্গজেবের সৎ ভাই ছিলেন। পূর্ববয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে আজম শাহ তাকে পিলখানার পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৭০৭ এর যুদ্ধে আজম শাহের মৃত্যুর পর চাকরি চলে যাওয়ার পর বাকি জীবনের জন্য তিনি সপরিবারে ১৭২০ সালে বাংলায় চলে আসেন। কিন্তু বাংলার তৎকালীন নবাব মুর্শিদকুলী খান তাকে গ্রহণ করেন নি। ফলে, মির্জা মুহাম্মদ আলী চুতাকে গমন করেন, যেখানে সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান তাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। সুজাউদ্দিন তাকে মাসিক ১০০ রুপি বেতনের চাকুরিতে নিয়োগ দান করেন। তার কাজ ও বিশ্বস্ততায় খুশি হয়ে তিনি তাকে পদোন্নতি দেন। বিশেষ করে তাকে উড়িষ্যার কিছু জমিদারির তদারকি দান করেন। মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর বাংলার মসনদ রক্ষায় সুজাউদ্দিনকে তিনি সাহায্য করেন। ফলশ্রুতিতে মির্জা মুহাম্মদ আলীকে চাকলা আকবরনগর (রাজমহল) এর ফৌজদার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৭২৮ সালে তাকে আলীবর্দী উপাধি দেওয়া হয়। নতুন ফৌজদারের অধীনে রাজমহলের জনগণ শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রদেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রে আলীবর্দী সুজাউদ্দিনের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তার কনিষ্ঠ ভতিজী জৈনুদ্দিন আহমেদ খানকে বিয়ে করেন। এ ভতিজী আমিনা বেগমের গর্ভেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার জন্ম হয়। আলীবর্দীর নিজের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। আলীবর্দী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে তার উত্তরসূরী ঘোষণা করেন।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭) : নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন বাংলার নবাব আলীবর্দী খান-এর নাতি। তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন। ১৭৪৬ সালে আলিবর্দী খান মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেল কিশোর সিরাজ তার সাথী হন। আলিবর্দী বালক সিরাজ-উদ-দৌলাকে অল্প বয়সে পাটনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। আলিবর্দী খানের জীবদ্দশায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ঢাকার নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এমতাবস্থায় চারদিকে গুরু হয় প্রচণ্ড অরাজকতা। এরকম দুর্ভোগময় পরিস্থিতিতেই আলিবর্দী খাঁ ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল শাহ কুলি খান মির্জা মোহাম্মদ হায়বৎ জং বাহাদুর (সিরাজ-উদ-দৌলা) বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। যখন সিরাজ-উদ-দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন থেকেই কলকাতায় ইংরেজদের প্রতাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন

কলকাতার ইংরেজ সৈন্যরা চন্দননগরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। সেখানে দুর্গ রক্ষার জন্য অল্প কছু সৈন্য রেখে তারা ১৩ জুন অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করে। বিদ্রোহের আভাস পেয়ে সিরাজ মীরজাফরকে বন্দি করার চিন্তা বাদ দেন। মীরজাফর পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে অঙ্গীকার করলেন যে, তিনি শরীরের একবিন্দু রক্ত থাকতেও বাংলার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না। অতপর গৃহবিবাদের মীমাংসা করে তিনি রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, মীরজাফর, মিরমদন, মোহনলাল ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রেকে সৈন্য চালানোর দায়িত্ব দিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা শুরু করলেন। ২৩ জুন সকাল থেকেই পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজরা মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। ইংরেজরা ‘লক্ষবাগ’ নামক আমবাগানে সৈন্য সমাবেশ করল। বেলা আটটার সময় হঠাৎ করেই মিরমদন ইংরেজবাহিনীকে আক্রমণ করেন। তাঁর প্রবল আক্রমণে টিকতে না পেরে ক্লাইভ তার সেনাবাহিনী নিয়ে আমবাগানে আশ্রয় নেন। ক্লাইভ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ যেখানে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন সেখানে নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দুপুরের দিকে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে সিরাজ-উদ-দৌলার গোলা বারুদ ভিজে যায়। কিন্তু হঠাৎ করেই গোলার আঘাতে মিরমদন মৃত্যুবরণ করেন। ইংরেজদের পক্ষে সাতজন ইউরোপিয়ান এবং ১৬ জন দেশীয় সৈন্য নিহত হয়। তখন কোন উপায় না দেখে সিরাজ-উদ-দৌলা রাজধানী রক্ষা করার জন্য দুই হাজার সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু রাজধানী রক্ষা করার জন্যেও কেউ তাঁকে সাহায্য করেনি। রাজধানী থেকে বের হয়ে স্থলপথে ভগবান গোলায় পৌঁছে যান এবং সেখান থেকে নৌকাযোগে পদ্মা ও মহানন্দার মধ্য দিয়ে উত্তর দিক অভিমুখে যাত্রা করেন। ৩/৪ জুলাই মীরজাফরের আদেশে তার পুত্র মিরনের তত্ত্বাবধানে মুহম্মদী বেগ নামের এক ঘাতক সিরাজ-উদ-দৌলাকে হত্যা করে। কথিত আছে, সিরাজ-উদ-দৌলার মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে সারা শহর ঘোরানো হয়। মুর্শিদাবাদের খোশবাগে নবাব আলিবর্দী খানের কবরের কাছে তাঁকে কবর দেয়া হয়। পলাশীর যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যুর পরই ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়।

ব্রিটিশ বাংলার নবাব শাসনামল

মীরজাফর (১৭৫৭-১৭৬০ ও ১৭৬৩-১৭৬৫) : মীরজাফর, যাঁর সম্পূর্ণ নাম মীর জাফর আলী খান তিনি ছিলেন বাংলার একজন নবাব। তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। নবাব আলিবর্দী খান তার দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে বাংলার নবাব করায় ক্ষুব্ধ হন মীরজাফর। তাই তিনি প্রধান সেনাপতি হয়েও কখনোই সিরাজ-উদ-দৌলাকে নবাব হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। সব সময় তিনি চেয়েছেন বাংলার নবাবের পতন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রবার্ট ক্লাইভ এর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং পলাশীর যুদ্ধে তাঁর কারণেই ব্রিটিশদের হাতে পরাজিত হন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। মুষ্টিমেয় ইংরেজ শাসক বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় বাংলায় তাদের শাসন ক্ষমতা পোক্ত করে এবং সোয়া দুইশ বছর এদেশ শাসন করে। এই যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীরজাফরকে নবাবের মসনদে অধিষ্ঠিত করে। মাত্র তিন বছর শাসন পরিচালনা করার পর তিনি তার জামাতা মীর কাসিম এর কাছে

ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে তার জামাতা মীর কাসিম ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন। তবে তিনিও বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেন নি। দ্বিতীয় মেয়াদে ১৭৬৩-১৭৬৫ মীরজাফর শাসন করেন। ১৭৬৫ সালেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নবাব মীর কাসিম (১৭৬০-১৭৬৩) : কলকাতা কাউন্সিল নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মীরজাফরকে মসনদ থেকে নামিয়ে তার জামাতা মীর কাসিমকে নবাব নিযুক্ত করেন। কিন্তু কাউন্সিলের পরিকল্পনাকে ভুল প্রমাণিত করেন। মীর কাসিম ছিলেন কর্মক্ষম, বুদ্ধিমান, তেজস্বী নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন তিনি। ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে তিনি বন্দুক, গুলি, কামান তৈরির কারখানাও স্থাপন করেন, সেখানে যথেষ্ট উন্নত মানের আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি হতো। তিনি কখনোই ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। বারংবার ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তিনি বারবার পরাজিত হন। তিনি ছিলেন রক্ষ ও সম্ভ্রমবাহিক, শোনা যায় টাকা আদায়ের জন্য রায়বল্লভের হাতের নখের মধ্যে সূচ ঢুকিয়ে দিতে আদেশ দেন এবং তাঁরই আদেশে বিহারের নায়েব রামনারায়ণ ও রায়বল্লভকে গলায় বালির বস্তা বেঁধে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা হয়। শোনা যায়, বারবার পরাজয়ের গ্লানিতে মীরকাসিম পাগল হয়ে দিল্লীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। দিল্লীর রাজপথে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তারপর জাফরাগঞ্জে এনে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

নাজিম-উদ-দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬) : নাজিম উদ্দিন আলী খান যিনি নাজিম-উদ-দৌলা (বা নাজাম-উদ-দৌলা) নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৭৬৫ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। তিনি ছিলেন মীর জাফরের দ্বিতীয় পুত্র। নাজিম-উদ-দৌলা তার পিতা মীর জাফরের মৃত্যুর পর রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। রাজ্যাভিষেকের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। তিনি ফেব্রুয়ারি ৫, ১৭৬৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৬৫ সালে বঙ্গের যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়লাভের ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম-এর কাছ থেকে দেওয়ানী (রাজ্য শাসনের জন্য পদ) লাভ করে। ১৭৬৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে নবাব কর্তৃক ব্রিটিশদের কাছে দেওয়ানী অর্পণ করা হয়। নাজিমুদ্দিন, মুর্শিদাবাদের দুর্গে রবার্ট ক্লাইভের সম্মানে দেওয়া একটি পার্টিতে জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ১৭৬৬ সালের ৮ মে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে জাফরাগঞ্জের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে তার ছোট ভাই নাজাবুত আলী খান নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন।

নাজাবুত আলী খান (সাইফ-উদ-দৌলা) (১৭৬৬-১৭৭০) : নাজাবুত আলী খান বাহাদুর, জন্মনাম মীর ফুলওয়ারী। নাজাবুত আলী খান ১৭৬৬ সালে তার বড় ভাই নবাব নাজিমুদ্দিন আলী খানের মৃত্যুর পর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাজাবুত আলী খান, সাইফ-উদ-দৌলা নামেই বেশি পরিচিত। তিনি ছিলেন মুন্সী বেগম ও মীর জাফরের তৃতীয় পুত্র। সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। তিনি তার মায়ের তত্ত্বাবধানে

সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ১০ মার্চ ১৭৭০ সালে গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ আশরাফ আলী খান (১৭৭০-১৭৯৩) : তিনি ছিলেন মীর জাফর বাহাদুরের চতুর্থ সন্তান। আশরাফ আলী খানকে তার চাচী নফিশাত উন নিসা বেগম সাবিহা দত্তক নিয়েছিলেন। ১৭৭০ সালের ১০ মার্চ তার বড় ভাই নাজাবুত আলী খানের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নাজিম হিসেবে প্রচারণা চালান। তিনি ১৭৭০ সালের ২১ মার্চ মুর্শিদাবাদের খাহার ব্যালিশে দুর্গে অফিসিয়ালি নবাব হিসেবে আসন গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ২৩ বছর শাসন পরিচালনা করেন।

সৈয়দ বাবর আলী খান (১৭৯৩-১৮১০) : নবাব নাজিম বাবর আলী খান ছিলেন আশরাফ আলী খানের অন্যতম প্রধান স্ত্রী ফাইজ-উন-নিসা বেগমের পুত্র। তার পিতা আশরাফ আলী খান ৬ সেপ্টেম্বর ১৭৯৩ সালে মৃত্যুবরণ করলে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাবর আলী খানের দুজন স্ত্রী ছিল এবং তাদের ঘরে দুই পুত্র ছিল। বড় পুত্রের নাম জৈনুদ্দিন আলী খান। বাবর আলী খান ১৭৯৩ সালে সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে ১৮১০ এর ২৮ এপ্রিল তার মৃত্যু পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮১০ সালে বাবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র জৈনুদ্দিন আলী খান নবাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

পরবর্তীতে জাইন উদ্দীন আলী খান বাহাদুর (১৮১০-১৮২১), আহমেদ আলী খান বাহাদুর (১৮২১-১৮২৪), মুবারক আলী খান বাহাদুর (১৮২৪-১৮৩৮) এক্সনসুর আলী খান বাহাদুর (১৮৩৮-১৮৮০) সাল পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন, তবে ১৮৮০ সালে মনসুর আলী খান পদত্যাগ করেন। এরপর ১৮৮০ সালে বাংলার নবাব উপাধিটি বিলুপ্ত হওয়ার পর ১৮৮১ সালে বাংলার নবাব পদটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে মুর্শিদাবাদের নবাব উপাধিটি চালু হয়। মুর্শিদাবাদের তিনজন নবাব ছিলেন, হাসান আলী মির্জা খান বাহাদুর (১৮৮২-১৯০৬) পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন।

এভাবেই খ্রিস্টপূর্ব থেকে বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সময়ের পরিবর্তনে নানা বংশের লোক আমাদের এ বাংলাকে শাসন করেছেন। তাদের এ শাসন ব্যবস্থায় অনেকটা “জোর যার মুল্লুক তার” নীতি চালু ছিল।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. আবু মু. দেলোয়ার হোসেন
২. বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. মুহা. মাহবুবুর রহমান
৩. History of Bangladesh 2006
৪. বাঙ্গলার ইতিহাস (নবাবী আমল), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
৬. বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১), মাহবুবুর রহমান
৭. বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০ ইং

লেখক

কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ থেকে ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতা (১৯০৫-১৯৪৭)

মুহাম্মাদ মাহবুব আলম

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালটি ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল হিসেবে পরিগণিত। এ উপমহাদেশে অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ববৃহৎ দু'টি সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস। দীর্ঘদিন যাবত এখানে সম্প্রীতির মাধ্যমে জীবন-যাপন, আধিপত্য বিস্তারকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র এবং ব্রিটিশদের চক্রান্তের মাধ্যমে তা বিনষ্টকরণ এবং সর্বশেষ ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান-ভারত নামে দু'টি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়সহ যাবতীয় বিষয়াবলী ইতিহাসে স্পষ্ট।

বঙ্গভঙ্গ

ব্রিটিশ-ভারত ও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালে ভারতের তৎকালীন বড়লিট লর্ড ডব্লিউ নাথানিয়েল কার্জন (লর্ড কার্জন নামে পরিচিত) বাংলা প্রদেশ ভাগ করেন, যা ইতিহাসে 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত।

বঙ্গভঙ্গের কারণ

বঙ্গভঙ্গের কারণ বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকরা দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন কর্তারা প্রশাসনিক কারণকে বঙ্গভঙ্গের মূখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করেন বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। আবার ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেন বঙ্গভঙ্গের পেছনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

১. প্রশাসনিক কারণ : গুরু থেকেই প্রশাসনিক কারণকেই বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। লর্ড কার্জন বারবার একে প্রথম শ্রেণির প্রশাসনিক সংস্কার হিসেবে দাবি করেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বাংলা একটি বিশাল প্রদেশ। বিভক্তির আগে বিহার, ছোট নানপুর, উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত ছিল। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল। এর জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫০ লক্ষ। অথচ আরও বড় দুটি প্রদেশ যেমন- যুক্ত প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল ৪৮-৫০

মিলিয়ন এবং মাদাজ প্রদেশের ৪২.৫০ মিলিয়ন। একজন গভর্নরের পক্ষে এ বিশাল প্রদেশের শাসন পরিচালনা করা দূরহ হয়ে পড়ে। এ কারণে লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতার জন্য বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কাজ করেন।

২. **রাজনৈতিক কারণ :** সুমিত সরকারের মতে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নথিপত্র এবং প্রশাসকদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ব্রিটিশ শাসকরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাঙালি জাতির প্রতি অবিমিশ্রিত ঘৃণা থেকেই কার্জন বঙ্গভঙ্গের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এ দিকটি ব্রিটিশ কর্মকর্তারা গোপন রাখার চেষ্টা করেন। লর্ড মিন্টেট যিনি কার্জনের নীতির ঘোরতর সমালোচক ছিলেন। তিনিও স্বীকার করেছেন, “From a political point of view alone of believe partition to have been very necessary”.
৩. **অর্থনৈতিক কারণ :** কলকাতা ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র। ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাংলা প্রদেশের সকল প্রকার অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পূর্ব বাংলায় অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। তাই জমিদাররা কলকাতায় অবস্থান করতেন। তাদের অনুপস্থিতিতে নিরীহ পূর্ব বাংলায় কৃষকদের উপর শোষণ চলতো। পূর্ব বাংলার প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট। এতদসত্ত্বেও পূর্ব বাংলায় পাটকল তৈরি না করে হুগলী নদীর তীরে পাটকল তৈরি করা হয়। ফলে পাটের প্রকৃত মূল্য থেকে তারা বঞ্চিত হত। তৎকালে সরকারী চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় পূর্ব বাংলায় অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে।
৪. **সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ :** ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে তাদের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য হারাতে থাকে। ফলে ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ তাদের হতগৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব জোরালোভাবে সমর্থন করেন। এছাড়া অধিকার বঞ্চিত মুসলমানদের দাবি আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মনীষীর সোচ্চার আবেদন তাদেরকে আত্মসচেতন করে তোলে।

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম-এর ইরা পত্রিকায় প্রদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে ৮টি সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়। তা হলো :

১. ঢাকা নগরের পূনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি।
২. নদী ও খালগুলোর উন্নতি, রেল লাইনের সম্প্রসারণ এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে এর সংযোগ স্থাপন।
৩. নতুন প্রাদেশিক পরিষদ গঠন।
৪. সুষ্ঠু শাসন ও জনসাধারণের জানমালের অধিকতর নিরাপত্তা।

৫. পূর্ব বাংলার শিক্ষিত ও সভ্য লোকদের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে অনুন্নত আসামের অধিবাসীদের উপকার।

৬. পূর্ব বাংলার জন্য কর্মদক্ষ পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা।

৭. প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি।

এক বছরের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত সুবিধাগুলো পূর্ব বাংলা লাভ করে।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গের ফলে কিছু শ্রেণির মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এসব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ছিল-

১. মধ্যবিভক্ত বাঙালি হিন্দু ও বর্ণবাদী হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া : ১৯০৩ সালের শেষ দিকে প্রথম বারের মতো বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর পরই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। তবে বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হলে হিন্দু সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কলকাতাকেন্দ্রিক সাধারণ মধ্যবিভক্ত বাঙালি হিন্দু ও বর্ণ হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে।
২. কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া : হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রতিবাদ সভায় প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অংশ নেন এবং বঙ্গ বিভক্তি বাতিলের দাবি জানান।
৩. সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া : কলকাতার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার মালিক ছিলেন তখন মধ্যশ্রেণির বা জমিদার। তারা চিন্তা করেছিলেন নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হলে তাদের ব্যবসা ও প্রভাব ক্রমশ কমে যাবে। এ কারণে হিন্দু মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভূমিকা পালন এবং ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য চাপ দেয়। এছাড়াও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াও ছিল লক্ষণীয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১)

বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্টি স্বদেশী বয়কট আন্দোলন তীব্র সন্ত্রাসবাদীরূপ নিলে ব্রিটিশ সরকার সমস্যার মুখোমুখি হয়। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের শাসন বিভাগে দুটি পরিবর্তন দেখা দেয়। বড়লাট ঘোষণা করেন, ব্রিটিশ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে এসে দিল্লিতে এক দরবার করবেন। সেজন্য কংগ্রেস নেতাদের সম্মুখিত করার জন্য তিনি আপোষনীতি গ্রহণ করেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। ১৯১১ সালের ২৫ আগস্ট বড়লাট ভারত সচিবের কাছে এক গোপন বার্তায় ভারতের প্রশাসনে কতিপয় পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। এই পরিবর্তনের মধ্যে প্রথমত- ভারত সরকারের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়। বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলাদেশ থেকে পৃথক করা হয়। নতুন প্রদেশের জনসংখ্যা হয় ৪ কোটি ২০ লক্ষ এবং আয়তন ৭০ হাজার বর্গমাইল। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ

বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। নতুন ব্যবস্থা ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কার্যকর হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ :

১. বঙ্গভঙ্গ রদের কারণগুলো হলো-
২. সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ।
৩. কংগ্রেসের বিরোধিতা।
৪. স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসী তৎপরতা।
৫. ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব।
৬. মুসলিম লীগের দুর্বলতা।

খিলাফত আন্দোলন ১৯১৯-১৯২৪

খিলাফত আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। হিন্দু ও মুসলমানরা একই মঞ্চে এসে এ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ নেয়। যদিও শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন সফল হয়নি। কিন্তু এ আন্দোলনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত হয় তা পরবর্তীকালে বহু আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে। এর গুরুত্ব সম্পর্কে ড. বিপিন চন্দ্র বলেন, “খিলাফত আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন স্রোতধারা নিয়ে আসে”।

খিলাফত আন্দোলন গঠনের কারণ :

১. **ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং তুরস্ক বিভাজিকরণ :** প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৯) বিশ্ব দু’টি যুদ্ধমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মিত্র শক্তির নেতৃত্ব দেয় গ্রেট ব্রিটেন এবং জার্মানি নেতৃত্ব দেয় অক্ষ শক্তির। ভারতের মুসলমানরা তুরস্ককে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক এবং তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলে মনে করতো। এভাবে দেখা যায় ভারতীয় মুসলমানরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত হলেও ধর্মীয় দিক দিয়ে তুরস্কের অনুগত। ভারতের মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য ব্রিটেন বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেয়। যুদ্ধ চলাকালে তাদের পবিত্র স্থানগুলোয় কোন ক্ষতি করবে না এবং যুদ্ধ শেষে তুরস্ককে বিভক্ত করা হবে না। তুর্কি খিলাফত রক্ষা ও ব্রিটিশ ইউরোপীয় শক্তিগুলোর কাছ থেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়।
২. **ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন :** প্রথম মহাযুদ্ধকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন খিলাফত আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯১৬ সালে লক্ষ্মী চুক্তির মাধ্যমে মুসলিমলীগ ও কংগ্রেস যৌথভাবে সংস্কার পরিকল্পনা পেশ করে। ১৯১৭ সালে অ্যানি বেসান্টের হোমরুল আন্দোলনকে মুসলিমলীগ সমর্থন দেয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পর্যায়ক্রমে ‘ভারতে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে’ এ প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভারতবাসী যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে সমর্থন দেয়। ১৯১৯ সালে প্রণীত রাওলাট আইনের আওতায় বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া

দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেয়া হয়। এ আইনের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদ জানায়। ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে তিনি খিলাফত আন্দোলনে সমর্থন ঘোষণা করেন। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে আন্দোলন গতি সঞ্চর করে।

খিলাফত আন্দোলনের পর্যায় ও কার্যক্রম

খিলাফত প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমানরা যে ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত আন্দোলন শুরু করে তার গতিধারায় তিনটি পর্যায় দেখা যায়।

১. প্রথম পর্যায় (ডিসেম্বর ১৯১৮-ডিসেম্বর ১৯১৯) : সুমিত সরকার খিলাফত আন্দোলনের দু'টি ধারার কথা উল্লেখ করেন। একটি নরমপন্থী ধারা, এর নেতৃত্বে ছিলেন মিরজা মুহম্মদ ছোটনির নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের কতিপয় ব্যবসায়ী। অন্যদিকে চরমপন্থী ধারার উদ্যোক্তা ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদসহ তরুণ নেতা, সাংবাদিক ও উলামা সম্প্রদায়। নরমপন্থীরা সাংবিধানিক উপায়ে গভর্নর জেনারেলের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ ইত্যাদির মধ্যে আন্দোলনকে সীমিত রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু চরমপন্থীরা হিন্দুদের সঙ্গে একজোট হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের পক্ষে ছিলেন।
২. দ্বিতীয় পর্যায় (১৯১৯-১৯২০) : ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরে নিখিল ভারত মুসলিমলীগের অধিবেশনে চরমপন্থীরা প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৯২০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি খিলাফতের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ইউরোপ সফর করেন। সেখানে তারা খিলাফত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ইতোমধ্যে ১৯২০ সালের ৯ মার্চ মহাত্মা গান্ধী তার প্রথম অসহযোগ ইশতেহার প্রকাশ করে খিলাফত প্রশ্নে ও পাঞ্জাব ঘটনার সুবিচার না করা হলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার ডাক দেন। ১৯ মার্চ সারা ভারতে হরতাল, খিলাফত দিবস পালনের নির্দেশ দেন। খিলাফত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯ মার্চ হরতাল, শোভাযাত্রা, জনসভা সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়।
৩. তৃতীয় পর্যায় (১৯২০-১৯২৪) : ১৯২০ সালের মে মাস থেকে খিলাফত কমিটি মুম্বাই গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে চরমপন্থী গোষ্ঠীর দখলে চলে যায়। গান্ধী গভর্নর জেনারেলকে দেয়া এক পত্রে অসহযোগের সমর্থন করে বলেন, মুসলমানদের জন্য কেবলমাত্র ৩টি পথ খোলা আছে; সশস্ত্র যুদ্ধ, হিজরত এবং অসহযোগ আন্দোলন।

খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ :

১. খিলাফতের অবাস্তব দাবি : তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা ও খলিফার পুনর্বাসন ছিল একটি অবাস্তব ও সময় অনুপযোগী দাবি। দীর্ঘ ৪০০ বছর ধরে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে থাকলেও এ সময় মক্কার শরীফ তুরস্কের সাথে সম্পর্ক ছিল করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করে। অথচ আরব জনগণের থেকে এর বিরুদ্ধে কোন জোরালো প্রতিবাদ উঠেনি। ফলে মুসলিম বিশ্বের আর কোন দেশই খিলাফতের জন্য আন্দোলনে নামেনি।

২. **আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির অনুপস্থিতি :** যে কোনো ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন তখনই জোরদার হয়ে ওঠে যখন তার পেছনে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষোভ, শোষণ ও অসন্তোষ মানুষকে মরিয়া করে তোলে। অথচ সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দূর করার কোন কর্মসূচি ছিল না।
৩. **নেতৃত্বের অভাব :** যোগ্য নেতার অভাবে এ আন্দোলন সফল হতে পারেনি। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ, বার বার গ্রেপ্তার হলে অন্য কোনো মুসলিম নেতার সর্বভারতীয় পরিচিতি ছিল না। এছাড়াও হিন্দু ও মুসলমানদের অবিশ্বাস, রাজনৈতিক দলগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আন্তরিকতার অভাব ও সহিংসতা ছিল অন্যতম।

ফলাফল :

কোনো আন্দোলনই এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি। খিলাফত আন্দোলন থেমে গেলেও ফলাফলের দিক থেকে এটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলা যায় না। এই আন্দোলন মুসলমানের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রথম মুসলমানরা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কে কে আজিজের মতে, খিলাফত আন্দোলন মুসলমানদের ব্রিটিশ আনুগত্যকে ধ্বংস করে। মুসলমানরা এরপর স্বাধীনতার দাবি তোলে যা ২৫ বছর পর ১৯৪৭ সালে সফল হয়।

খিলাফত আন্দোলনের গুরুত্ব

খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এ আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল সুদূর প্রসারী।

- ক. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা;
- খ. রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ;
- গ. ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রেরণা লাভ;
- ঘ. স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা লাভ;
- ঙ. নতুন মুসলিম নেতৃত্বের সৃষ্টি;
- চ. মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রেরণা;
- ছ. অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরণা;
- জ. কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তন ও দ্বিধাবিভক্তি;
- ঝ. হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল;
- এং. ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ।

অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)

১৯২০ সাল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। খিলাফত কমিটি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেও ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধী অসহযোগের পরিকল্পনা পেশ করেন। এতে- ১. সরকারী খেতাব ও সম্মানসূচক উপাধি বর্জন, ২. সরকার অনুমোদিত স্কুল, কলেজ বয়কট, ৩. বিচারালয় বর্জন, ৪. বিদেশী বস্ত্র বর্জন ইত্যাদি পেশ করা হয়। এতে এক দিকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দেয়। জে.বি কৃপালনী বলেন, জনসাধারণ বিদেশী শাসনের

বিরুদ্ধে ইতিবাচক ও ভয়হীন চিন্তে সমবেতভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তীতে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে অসহযোগ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আইন প্রণয়নের পর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আন্দোলন এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবাসীর সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার ১৯৩৫ সালে আইন প্রণয়ন করে গণঅসন্তোষ প্রশমনের চেষ্টা করে।

ভারত শাসন আইনের পটভূমি :

১. ১৯১৯ সালের আইনের ব্যর্থতা : ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের সম্মুখীন করতে ব্যর্থ হয়। এই আইন ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন প্রদানে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। এ কারণে আর একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।
২. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন : ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন ঘোষণার পর ভারতে ব্যাপক সংহিসতা দেখা দেয় এবং প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন হয়। আন্দোলন, দমনে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাস (মার্চ ১৯১৯) করে এবং এ আইনের প্রতিবাদে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার চরম পরিণতি দেখা যায় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে। এর পর পর মহাত্মা গান্ধী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা করেন।
৩. বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) : এ সময় স্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একদল ত্যাগী নেতা গড়ে তোলেন স্বরাজ দল। মূলত আইন পরিষদে সদস্য থেকে পরিষদের ভেতরে, সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাধা দিয়ে ভারতীয়দের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেয়ার চাপ সৃষ্টিই ছিল এদের লক্ষ্য।
৪. সাইমন কমিশন (১৯২৭) : ভারতীয়দের অসন্তোষ দূর করার জন্য ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে সাইমন কমিশন নিযুক্ত করে। প্রবল বাধা সত্ত্বেও কমিশন ১৯৩০ সালে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়।
৫. নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮) ও জিন্মাহর চৌদ্দফা (১৯২৯) : নেহেরু রিপোর্ট দুটি বিকল্প প্রস্তাব পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ডোমিনিয়নের মর্যাদা, যুক্তরাষ্ট্র, লন্ডন, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট ভারতীয় পার্লামেন্ট, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন বাতিলের প্রস্তাব করে। অন্যদিকে জিন্মাহর চৌদ্দফায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এতে ভারতীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।
৬. গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০-৩২) : ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ডেকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রস্তাব দেন। তবে কংগ্রেস এ বৈঠকে যোগ দেয়নি, অন্যদিকে মুসলিম প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের দাবিতে বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩১ সালে

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকও ব্যর্থ হয়। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩২) কংগ্রেস যোগ না দেয়ায় এটিও ব্যর্থ হয়। এর ফলে সাংবিধানিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়।

৭. **শ্বেতপত্র (১৯৩৩)** : সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার একটি ‘শ্বেতপত্র’ প্রকাশ করে এর শিরোনাম ছিল “ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য প্রস্তাব সমূহ”।

ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য :

১. সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র;
২. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন;
৩. ক্ষমতা বন্টন;
৪. কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন;
৫. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা;
৬. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত;
৭. পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা;
৮. উপদেষ্টা বোর্ড গঠন;
৯. সংবিধান সংশোধন;
১০. প্রাদেশিক গভর্নর;
১১. ভারত সচিবের ক্ষমতাহ্রাস;

১৯৩৭ সালের নির্বাচন : ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস, মুসলিমলীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি এ প্রধান ৩টি দল প্রতিদ্বন্দ্বি হলেও বাংলার নির্বাচনে মুসলিমলীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়। কৃষক প্রজাপার্টি ফজলুল হককে সভাপতি, শামসুদ্দিন আহমেদ পরে রজব আলী তরফদারকে সেক্রেটারি নিযুক্ত করে পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করে। অন্যদিকে ঢাকার নবাবকে প্রেসিডেন্ট ও সোহরাওয়ার্দীকে সেক্রেটারি করে মুসলিমলীগ কমিটি গঠন করে।

নির্বাচনের ফলাফল : নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, ২৫০টি আসনের মধ্যে ১১৭টি সংরক্ষিত মুসলিম আসনের মুসলিমলীগ ৩৫, প্রজাপার্টি ৩৬, ত্রিপুরা কৃষক সমিতি ৩৫ এবং স্বতন্ত্র মুসলমান ৪১টি আসন পায়।

লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিমলীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যা ‘লাহোর প্রস্তাব’ নামে পরিচিত। মুসলিমলীগ সভাপতি মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে তদানীন্তন বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী এ.কে.ফজলুল হক এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, “আমি প্রথমে মুসলমান এবং পরে বাঙালি। ১৯০৬ সালে বাংলাদেশেই প্রথম মুসলিমলীগের নিশান উত্তোলিত হয়েছিল। এখন বাংলাদেশের নেতা হিসেবে সেই

মুসলিমলীগের মঞ্চ হতে আমি মুসলমানদের জন্য আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকার পেয়েছি”। যদিও এই প্রস্তাব পরবর্তীকালে বিকৃত করে ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ হিসেবে রূপ দেয়া হয়, যার অনিবার্য পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি : লাহোর প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্তশাসন। এই দাবির সূত্রপাত ঊনবিংশ শতকেই শুরু হয়। যে সকল কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিমলীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি সম্বলিত লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলো :-

১. **স্যার সৈয়দ আহমদের ভূমিকা :** ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপণ করেন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, ভারতে দুটি ভিন্ন জাতি বসবাস করে। যে কারণে তিনি হিন্দু প্রভাবিত কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দিতে বারণ করেন।
২. **ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা :** ১৯০৬ সালে মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মুসলমানরা পৃথক জাতি হিসেবে ভাবতে থাকে। ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেয়া হয়। ১৯০৯ সালে ইংল্যান্ডের হাউস অব লর্ডস এ লর্ড মর্লি ঘোষণা করেন, ভারতীয় মুসলমানরা শুধুমাত্র একটি পৃথক ধর্ম অনুসরণ করে তা নয়, সামাজিক আচরণ ও জীবনযাত্রার দিক দিয়ে তারা একটি পৃথক জাতির সমতুল্য।
৩. **লক্ষ্মী চুক্তি ও জিন্মাহর চৌদ্দ দফা :** প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও পরে মুসলমানরা স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করে আসছিল। লক্ষ্মী চুক্তির (১৯১৬), জিন্মাহর চৌদ্দ দফা (১৯২৯) দাবিতে এর প্রতিফলন ঘটে।
৪. **নেহেরু রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া :** ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিধানের অগ্রগতির ইতিহাসে নেহেরু রিপোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সকল রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে ব্রিটিশ ভারতের সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ১৯২৮ সালে নেহেরু কমিটি গঠিত হয়। নেহেরু রিপোর্টের সুপারিশ বিবেচনার জন্য কলকাতায় সর্বদলীয় অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এ অধিবেশনে মুসলিমলীগ ও খিলাফত কমিটির দাবি বিবেচনার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। পরে সাব-কমিটিতে নেহেরুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।
৫. **হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের প্রভাব :** উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে যখন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মন্তব্য করেন যে, ভারত দু’টি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষণীয় একটি সরকার, অপরটি কংগ্রেস দল। তাদের মনোভাব মুসলমান নেতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জিন্মাহ এতদিন পর্যন্ত রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রবক্তা ছিলেন, তিনিও এতে ব্যথিত হন।
৬. **গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা :** ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে চরম উত্তেজনা প্রশমন এবং হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের লক্ষে লন্ডনে ব্রিটিশ সরকার, ভারতীয় বিভিন্ন দল, সম্প্রদায় ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে

১৯৩৯ সালে গোলটেবিলের আয়োজন করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একগুয়েমীর কারণে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়।

৭. মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রাচুর্য চিন্তাধারা : লাহোর প্রস্তাবে যে স্বাধীন মুসলিম আবাস ভূমির দাবি করা হয়েছে, অনুরূপ একটি প্রস্তাব ১৯৩০ সালে মহাকবি আল্লামা ইকবাল এলাহাবাদে তার একটি ভাষণে উল্লেখ করেন। তিনি ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমান জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

৮. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কার্যকারিতা : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। এজন্য কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ উভয় দলই এর বিরোধিতা করায় এ আইন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। শুধু বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশে মুসলিমলীগের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু মুসলিমলীগের সাথে কোন আলাপ আলোচনা ছাড়াই কংগ্রেস মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মন্ত্রিসভা গঠন করে। এরপর থেকে আস্তে আস্তে বিরোধ শুরু হয়, শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে পর্যন্ত বাধা দেয়ার মত ঘটনা ঘটে।

৯. জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব ঘোষণা : লাহোরে মুসলিমলীগের ২৭ তম অধিবেশন ১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন, যা জিন্নাহর বিখ্যাত 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' নামে পরিচিত। মি : জিন্নাহ তার তত্ত্বে উল্লেখ করেন, ভারতবর্ষে ২টি পৃথক জাতি রয়েছে, যথা : হিন্দু জাতি ও মুসলিম জাতি। তিনি বলেছেন, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলিমলীগ নেতৃবৃন্দ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক অথচ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জোরদারী করছে। তারা মনে করেন হিন্দু ও মুসলমানদের বিরোধ মৌলিক আর এ ধারণাই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার সুবিখ্যাত দ্বি-জাতিতত্ত্ব তুলে ধরেন।

১৯৪৬ সালের নির্বাচন : ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ৯ বছরের ব্যবধানে ভারতের সাধারণ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচনে মোট ১৫টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। দলগুলো হচ্ছে- মুসলিমলীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, জামাতে উলামায়ে হিন্দ, মুসলিম পার্লামেন্ট বোর্ড, ইমারত পার্টি, ন্যাশনাল মুসলিমলীগ, কংগ্রেস, র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, তফসিল ফেডারেশন, হিন্দু মহাসভা, ক্ষত্রিয় সমিতি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, এ্যাংলো ইন্ডিয়া ও ভারতীয় খ্রিষ্টান। যদিও ১৫টি দল অংশ নেয় কিন্তু নির্বাচন মূলত মুসলিমলীগ ও কংগ্রেসের নির্বাচনে পরিণত হয়।

নির্বাচনের ফলাফল : বঙ্গীয় আইন পরিষদের ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিমলীগ সর্বোচ্চ ১১৪টি আসন পায়। কংগ্রেস দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮৬টি আসন পায়। কৃষক প্রজা পার্টি চরম বিপর্যয় ঘটে। তারা পায় মাত্র ৪টি। অথচ মুসলিমলীগ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ৩৭টি, কংগ্রেস ৩৯টি এবং কৃষক প্রজাপার্টি ৩৫টি আসন পেয়েছিল। নির্বাচনে কংগ্রেসও ভাল করে। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এ নির্বাচনে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় মুসলমান ভোটাররা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন দিয়েছে।

বাংলা বিভক্তি (১৯৪৭)

ঐতিহাসিক এমএ রহিম বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস গ্রন্থে বাংলায় বিভক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, “এটি বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যে হিন্দু নেতাগণ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বঙ্গভঙ্গ রদ করেছিলেন তারাই আবার ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ বিভাগের দাবি করেছিলেন। আবার যে মুসলমান নেতারা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় খুশি হয়েছিলেন তারা ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন”। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক সমঝোতার অভাব, ব্রিটিশ সরকারের আন্তরিকতার অভাব সর্বোপরি তৎকালীন ভারতবর্ষের দু’টি প্রধান দল কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতার কারণে অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাও বিভক্ত হয়।

বাংলা বিভাগের পটভূমি :

১. **ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহ :** বাংলা একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশ। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর কলকাতার রাজধানী স্থাপনের ফলে এর গুরুত্ব ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভঙ্গ রদের সময় কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর হলেও বাংলার কেন্দ্র হিসেবে কলকাতা সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে বহাল থাকে। অবশ্য ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্র শক্তির জয়লাভ ও ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে এ্যাটলির শ্রমিক দলের জয়লাভ ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব পড়ে। নতুন প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করেন।
২. **১৯৪৬ সালের নির্বাচন :** ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিমলীগ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিমলীগ ১২২টি আসনের মধ্যে ১১৭টি লাভ করে। অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও মুসলিমলীগ জয়ী হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদের মোট ৫০৭টি সদস্য আসনের মধ্যে মুসলিমলীগ ৪৭২টি আসন পায়।
৩. **মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার সুপারিশ বাস্তবায়ন :** নতুন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে ‘মন্ত্রী মিশন’ নামে একটি প্রতিনিধি দলকে ভারতে পাঠায়। ১৬ এপ্রিল জিন্নাহর সাথে মন্ত্রী মিশনের বৈঠকে পাকিস্তান দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। মন্ত্রী মিশন কংগ্রেস ও লীগের সাথে বৈঠকের পর মে মাসে তাদের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন।
৪. **মুসলিমলীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা :** ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে মুসলিমলীগ পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। এর ফলে রাজনৈতিক অবস্থা জটিল হয়ে পড়ে। কলকাতায় শুরু হয় দাঙ্গা। এ দাঙ্গায় ৪৮ ঘণ্টায় ৫০০ লোক মারা যায়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভারতে সাম্প্রদায়িক সংকট আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়।
৫. **ভারত ও বাংলা বিভাগের কংগ্রেসের অতি উৎসাহী মনোভাব :** বাংলা বিভাগের জন্য ১৯৪৬ সাল থেকেই কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করে এবং ৫৯টি জনসভার আয়োজন করে যার মাধ্যমে বাংলা বিভাগের পক্ষে জনমত গড়ে উঠে। এ পরিস্থিতিতে নেহেরু ও প্যাটেল ভারত বিভাগের ব্যাপারে তাদের ইতিবাচক

মনোভাব দেখাতে থাকেন। ভি.পি. মেনন বলেন, ১৯৪৬ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিক অথবা পরের বছর জানুয়ারি মাসেই এই দুই নেতাকে ভারত বিভক্তিতে রাজী করাতে সক্ষম হন। ইয়াম স্টিফেনস এ সম্পর্কে বলেন, ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এ রকম দাবী করা হতে থাকে যে, যদি প্রকৃতই উপমহাদেশ বিভক্ত করা হয় তাহলে তাদের প্রদেশও বিভক্ত করা হবে।

৬. **হিন্দু মহাসভার তৎপরতা :** ভারত বিভাগ সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে ভারতীয় হিন্দু মহাসভা নেতা ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বঙ্গভঙ্গের দাবি করেন এবং হিন্দু মহাসম্মেলনে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর সমন্বয়ে হিন্দু বঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটি বাংলা বিভক্তির পক্ষে আবারও মতামত ব্যক্ত করেন। এ দাবিতে মহাসভা এককভাবে ১২টি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে ৫টি জনসভা করে।
৭. **মাউন্টব্যাটেনের কংগ্রেসের প্রতি পক্ষাবলম্বী মনোভাব :** লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ থেকে তার কাজ শুরু করেন। অচল প্রায় কেন্দ্রীয় শাসন, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, আইন শৃঙ্খলা অবনতি এমনই পরিস্থিতিতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেন। প্রথম থেকেই তিনি কংগ্রেসের পক্ষাবলম্বন করেন।
৮. **অখণ্ড বাংলা আন্দোলনের ব্যর্থতা :** তবে বাংলা বিভাগের বিপক্ষে দিল মুসলিমলীগ ও শরণ বসুর। নেতৃত্বে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বঙ্গীয় মুসলিমলীগের এই আন্দোলনে প্রথম কেন্দ্রীয় লীগও সমর্থন দেয়। সোহরাওয়ার্দী ও শরণবসু উভয়ে এই লক্ষ্যে ২০ মে বৈঠক শেষে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা ‘সোহরাওয়ার্দী বসু চুক্তি’ নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগ প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। এমনকি বঙ্গীয় মুসলিমলীগের সভাপতি আকরম খাঁ এই প্রস্তাব সমর্থন করেননি। ফলে এই ব্যাপারটি বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।
৯. **বাংলা বিভাগ চূড়ান্তকরণ এবং মুসলিমলীগের সম্মতি প্রদান :** ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার আওতায় বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থা করেন। কংগ্রেস তাত্ক্ষণিক এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। জুন মাসের মুসলিমলীগের সভায় জিন্নাহ তার জীবদ্দশায় পাকিস্তান দেখার ইচ্ছা পোষণ করে কাউন্সিলরদের প্রতি ব্রিটিশ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে সমর্থনের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, আমাদের ব্রিটিশ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে অথবা সম্পূর্ণ নাকচ করতে হবে। পরিষদের ৪৫০ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। এমনকি সোহরাওয়ার্দী নিজে প্রস্তাবের পক্ষে রায় দেন। এরপর যুক্ত বাংলার পক্ষে সকল উদ্যোগ শেষ হয়।

তথ্যসূত্র :

1. Joya Chatterji, Bengal Divided (Cambridget Cambridge University Press, 1995).
2. আবু আল সাঈদ, সাতচল্লিশের অখণ্ড বাংলা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯)।

3. এম.এ.রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)
4. Abdul Mansur Ahmed, End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution. (Dacca: Khoshroz Kitab Mahal, 1975)
5. অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭২)
6. সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ
7. R.C. Majumher, History of the Freedom Movement in India, Vol. III (Calcutta : Firma KLM Pvt. Ltd. 1996)
8. S. Moinul Haq. “ the Khilafat Movement”, in A History of the Freedom Movement, Vol. III, Part- I (Karachi : Pakistan Historical Society, 1961).
9. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬)
10. সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৮-১৯৪৭)।
11. বিপুলরঞ্জন নাথ, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও রাজনীতি (ঢাকা: বুক সোসাইটি, ২০০৩)
12. Harun-or-Rashid. the Foreshadowing of Bangladesh (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987)
13. Humaira Momen, Muslim Politices in Bengal A Study of Krishak Praja Party and the Elections of 1937 (Dacca : Sunuy House, 1972)
14. Shila Sen, Muslim Politices in Bengali 1937-1947
15. এনায়েতুর রহিম, বাংলার স্ব-শাসন (১৯৩৭-১৯৪৩) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১)
16. Gautam Chattopadhyay, Bengal Electoral Politices and Freedom Struggle 1862-1947 (New Delhi : Indian Council of Historical Research, 1998)
17. M K U Molla, the New Province of Eas tern Bengal and Assam (Rajshahi : the Institute of Bangladesh Studies, 1981).
18. Mohammed Abdur Rahim, the Muslim Society and Politices in Bengal A.D. 1757-1947 (Dacca the University of Dacca, 1978)
19. অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতে মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী

লেখক

কেন্দ্রীয় স্কুল ও কলেজ বিষয়ক সম্পাদক
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

১৯৪৭-এর দেশ বিভাজন থেকে ১৯৫৪-এর নির্বাচন : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মাদ ইলিয়াস হাসান

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের পর প্রায় দুইশত বছর ইংরেজরা উপমহাদেশ শাসন করে। এই দীর্ঘ শাসন আমলে অনেক জীবন ও রক্তের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ জাতি ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে কিন্তু এক সময়ের সম্পদের ভাণ্ডার নামের ভারতীয় উপমহাদেশকে তলাবিহীন ঝুঁড়িতে পরিণত করে রেখে গেছে। ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলি ঘোষণা করেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পন করবেন। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের নতুন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে তিনি দেখলেন, ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতাকামী জনগণকে কোন ভাবেই দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাই মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের সাথে পরামর্শ করে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন এক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং ৪ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা ঘোষণা করেন।

এভাবেই ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বহু রকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুটি ভূখণ্ড নিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীন হয়। ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান এবং হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ভারত। নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তান দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুটি প্রদেশের সমন্বয়ে

গঠিত হয়- পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান। ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যোজন যোজন ব্যবধানে অবস্থিত এ দুটি অংশের মধ্যে মিল ছিল কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মে। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এর পূর্ব অংশ পশ্চিম অংশের তুলনায় নানাভাবে বঞ্চিত হতে থাকে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি অনুসন্ধান করে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণমূলক আচরণ। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপরও নিপীড়ন শুরু হয় এবং এর প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় যখন পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা দেন “উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা”। সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্যে এই আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। এদিন পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। আজ পৃথিবীব্যাপী ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলার মানুষ সব দিক থেকে বৈষম্যের শিকার হতে লাগল। আর দুটি দেশ ভাগ হওয়াতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বেশি লাভবান হলো। এক দিকে তারা যেমন পাঞ্জাবের মত উর্বর শস্য ক্ষেত্র ও উন্নত সেচ ব্যবস্থার অবকাঠামোগুলো পেয়ে গেল অন্যদিকে ভারতে ধনী ও শিক্ষিত মুসলমানগণ তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে উপস্থিত হলো কিন্তু বাংলার অবস্থা ঠিক এর উল্টা। এখানকার ধনী হিন্দুরা তাদের সম্পদসহ বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাড়ি দিল। এভাবেই ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীন আইন ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংকটের কিছুটা নিরসন হলেও এই আইনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এ আইন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ব বাংলাকে শোষণ করার হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে লাহোর প্রস্তাবের মৌলিক দিকের প্রকৃত বাস্তবায়ন না করায় তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা বাংলার জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা না করায় এই আইন বস্তৃত সমস্যা সৃষ্টি করেছে সমাধান দিতে পারে নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তার উজ্জ্বল প্রমাণ। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে জিন্নাহর মনে এবং চিন্তায় বড় ধরনের একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পাকিস্তানের গণপরিষদের ভাষণে জিন্নাহ ভুলে গেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলনীতির কথা এখন তিনি নতুন সূরে কথা বলতে শুরু করলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ আগস্ট তিনি গণপরিষদের ভাষণে বললেন, আজ থেকে পাকিস্তান কোন ধর্মের পরিচয়ে থাকবে না। সবাই পাকিস্তানী এটাই পরিচয়। তার এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় শুধু মাত্র ক্ষমতা অর্জন ও মুসলমানদের সমর্থন পাওয়ার জন্যই তার এই দ্বি-জাতিতত্ত্ব ছিল; কখনই তিনি মুসলমানদের বন্ধু ছিলেন না। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন সেক্যুলারিস্ট ছিলেন, ধর্ম তার নিকট বড় কোন বিষয় ছিল না।

১৯৪৭ পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থান

দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে একটা নতুন মোড় নিলো। মুসলিম লীগের তরুণ কর্মীরা কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের নেতাদের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন অন্য দিকে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মুসলিম লীগ সরকারের অযোগ্যতার সমালোচনা করতে লাগলেন। ঢাকা মুসলিম লীগের তরুণ বিক্ষুব্ধ নেতারা মাওলানা ভাসানীর চিন্তার সাথে তাদের মিল খুঁজে পেলেন। তারা মাওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগ করতে লাগলেন কিন্তু মাওলানা ভাসানী তাদের সাথে বেশি দিন সম্পর্ক রাখতে পারলেন না। কারণ তারা ছিল কিছুটা কমিউনিস্ট মানসিকতার। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম দল “গণআজাদী লীগ” গঠিত হয়। কিন্তু গণআজাদী লীগ কোন রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে পারেনি। কারণ নেতাদের অতি বাম কার্যকলাপের জন্য তারা কোনই জন সমর্থন পায়নি। বাংলার মানুষ ধর্মভীরু ছিল। তারা জানত বাম কমিউনিস্টরা আল্লাহ-রাসূল বিশ্বাস করে করে না। তাই গণআজাদী লীগ শুরুতেই মুখ খুবড়ে পড়ে।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ায় পূর্ব থেকেই মাওলানা ভাসানী মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধিতা করে আসছেন। ১৯৪৮ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য বাংলার মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে পূর্ব বাংলায় রাজস্ব আয়ের ৫০% কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন তখন মাওলানা ভাসানী তাকে প্রশ্ন করেন মূখ্যমন্ত্রী এ দেশের রাজস্ব আয় এর ৫০% কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পেলেন?

এভাবেই মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী মুসলিম লীগ সরকারের অযোগ্যতা ও বৈষ্যমের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন এবং বাংলার মানুষের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। মাওলানা ভাসানী ছিলেন একজন সাম্যবাদী নেতা। আর তার এই সাম্যবাদ সমাজতন্ত্র ও কালামার্কস এর সাম্যবাদ নয়। তার সাম্যবাদ ছিল কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত সাম্যবাদ। ইসলাম শিক্ষা তার মন ও মানসিকতার উপর প্রথমই যে প্রভাব বিস্তার করেছে সারা জীবন তিনি সেটাই লালন করেছেন। আমাদের দেশের কৃষকদের নিকট মাওলানা ভাসানী এক দিকে ছিলেন ধর্মীয় নেতা ও পীর অন্য দিকে অত্যাচারী জমিদার এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শিক্ষাগুরু।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

বর্তমানের পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র দুটি পূর্বে ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উর্দু ভাষাটি অধিক ব্যবহার শুরু হয়। এটি একটি ইন্দো-আর্য ভাষা, যা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য। এ ভাষাটি আবার ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। উর্দুর ব্যবহার ক্রমেই উত্তর ভারতীয়দের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে, কিন্তু বাংলার মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে তাদের প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহারেই অভ্যস্ত ছিল। বাংলা পূর্বাঞ্চলীয় মধ্য ইন্দো ভাষাসমূহ থেকে উদ্ভূত একটি পূর্বাঞ্চলীয় ইন্দো-আর্য ভাষা, যা বাংলার নবজাগরণের সময়ে বিপুল বিকাশ লাভ করে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রাচীন। আমরা দেখি মধ্যযুগের মুসলিম কবি আবদুল হাকিম বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁর কবিতা রচনা করেছেন এবং বলেছেন, যারা

বাংলায় জন্মগ্রহণ করে বাংলা ভাষাকে অস্বীকার করে তাদের কোন জন্ম পরিচয় কবি জানেন না। যখন ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্রের কথা উঠল তখন থেকে দেশের সবার মধ্যে এক মহা আলোড়ন পড়ে গেল যে, রাষ্ট্রভাষা কী হবে। কেউ কেউ হিন্দি আবার কেউ কেউ উর্দু আবার কেউ বাংলা ভাষার পক্ষে তাদের যুক্তি উপস্থাপন করল। ১৯১৮ সালে মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর (মহাত্মা গান্ধী) কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাষ্ট্রভাষা হিন্দির পক্ষে লিখেন, “The only possible national language for inter provincial inter-courser is Hindi in India”। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজিতে লেখা তার এক প্রবন্ধে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিন্দি করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। ১৯১৮ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রহ. এক প্রবন্ধের মাধ্যমে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা বাংলা হওয়ার পক্ষে তার যুক্তি উপস্থাপন করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে মুসলিম নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলার বিস্তার তখন থেকেই বিকশিত হয়।

আন্দোলনের সূচনা

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ ৬ কোটি ৯০ লাখ জনসংখ্যাবিশিষ্ট নবগঠিত পাকিস্তানের নাগরিকে পরিণত হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার, প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ১৯৪৭ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্রে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহারের সুপারিশসহ প্রচার মাধ্যম ও বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র উর্দু ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। ওই সমাবেশে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের প্রবল দাবি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাকে তাদের অনুমোদিত বিষয় তালিকা থেকে বাদ দেয় ও সাথে সাথে মুদ্রা এবং ডাকটিকেট থেকেও বাংলা অক্ষর বিলুপ্ত করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান মালিক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বানানোর জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং ১৯৪৭ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের একটি বিশাল সমাবেশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের আনুষ্ঠানিক দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্ররা ঢাকায় মিছিল এবং সমাবেশের আয়োজন করে।

নেতৃস্থানীয় বাঙালি পণ্ডিতগণ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে মত দেন। পাকিস্তানের কোনো অংশেই উর্দু স্থানীয় ভাষা ছিল না বলে উল্লেখ করেছেন ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বলেন, “আমাদের যদি একটি দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়, তবে আমরা উর্দুর কথা বিবেচনা করতে পারি।” সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমেদ বলেছেন, উর্দুকে যদি রাষ্ট্রভাষা করা হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ ‘নিরক্ষর’ এবং সকল সরকারী পদের ক্ষেত্রেই ‘অনুপযুক্ত’ হয়ে পড়বে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। তমদ্দুন মজলিশের

অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। পরবর্তীতে সংসদ সদস্য সামসুল হক আহ্বায়ক হয়ে নতুন কমিটি গঠন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে কার্যক্রম আরও জোরদার করেন।

গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষার দাবি

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজী ও উর্দুর পাশাপাশি সদস্যদের বাংলায় বক্তৃতা প্রদান এবং সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতায় বাংলাকে অধিকাংশ জাতিগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে উল্লেখ করে ধীরেন্দ্রনাথ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবি তোলেন। এছাড়াও সরকারি কাগজে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান তিনি। খাজা নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, “পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ চায় রাষ্ট্রভাষা উর্দু হোক”। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান এ প্রস্তাবটিকে পাকিস্তানে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা বলে উল্লেখ করে বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেবলমাত্র উর্দুই হতে পারে। অনেক বিতর্কের পর সংশোধনীটি বাতিল হয়ে যায়।

প্রথম প্রতিক্রিয়া

গণপরিষদের ঘটনার প্রথম প্রতিক্রিয়া শুরু হয় ঢাকায়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ) ছাত্রদের মিছিল হয় এবং তাদের উদ্যোগে শহরের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে। ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখেও ধর্মঘট ঘোষিত হয় এবং ঐদিন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ দিবস ও ধর্মঘট পালন করা হয়। সরকারের প্ররোচনায় পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করে এমনকি অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। তমদ্দুন মজলিস ঐ সময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশ ঘটে। ঐ সভায় দ্বিতীয় বারের মত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং শামসুল আলম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এ পরিষদে অন্যান্য সংগঠনের দুই জন করে প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেখান থেকে ছাত্ররা ১১ মার্চ ধর্মঘট আহ্বান করে।

১১ মার্চের কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য ১০ মার্চ ফজলুল হক হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ মার্চ ভোরে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে ছাত্ররা বের হয়ে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট পালিত হয়। সকালে ছাত্রদের একটি দল রমনা পোস্ট অফিসে গেলে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রদের আরও একটি দল রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সচিবালয়ের সামনে নবাব আবদুল গণি রোডে পিকেটিংয়ে অংশ নেয়। তারা গণপরিষদ ভবন (ভেঙ্গে পড়া জগন্নাথ হলের মিলনায়তন), প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউস (বর্তমান বাংলা একাডেমি), হাইকোর্ট ও সচিবালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে অফিস বর্জনের জন্যে সবাইকে চাপ দিতে থাকে, ফলে বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে পুলিশের লাঠিচার্জের সম্মুখীন হতে হয়। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা খাদ্যমন্ত্রী

সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল ও শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদকে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এ বিক্ষোভ দমনের জন্য সরকার সেনাবাহিনী তলব করে। পূর্ব পাকিস্তানের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ব্রিগেডিয়ার আইয়ুব খান (পরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি) মেজর পীরজাদার অধীনে একদল পদাতিক সৈন্য নিয়োগ করেন এবং স্বয়ং গণপরিষদে গিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিনকে বাবুর্চিখানার মধ্য দিয়ে বের করে আনেন। বিকেলে এর প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হলে পুলিশ সভা পণ্ড করে দেয় এবং কয়েকজনকে থেফতার করে।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফর

১৯ মার্চ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে পৌঁছান পাকিস্তানের স্থপতি ও গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ভারত বিভাগের পর এটাই ছিল তার প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক গণ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ও সেখানে তিনি ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে তিনি ভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও তিনি বলেন পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষা নির্ধারিত হবে প্রদেশের অধিবাসীদের ভাষা অনুযায়ী; কিন্তু তিনি দ্ব্যর্থহীন চিন্তে ঘোষণা করেন- “Urdu and urdu, shall be the state language of pakistan.” অর্থাৎ “উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়।” তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, “জনগণের মধ্যে যারা ষড়যন্ত্রকারী রয়েছে, তারা পাকিস্তানের শত্রু এবং তাদের কখনোই ক্ষমা করা হবে না।” জিন্নাহ’র এ বিরূপ মন্তব্যে তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে উপস্থিত ছাত্র-জনতার একাংশ। ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’- এ ধরনের একপেশে উক্তি আন্দোলনকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই ধরনের বক্তব্য রাখেন। তিনি উল্লেখ করেন, এ আন্দোলন সন্ধীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর বহিঃপ্রকাশ এবং অভিযোগ করেন কিছু লোক এর মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছে। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কথা পুনরাবলোকন করেন তখন উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে না, না বলে চিৎকার করে ওঠে।

একই দিনে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল জিন্নাহ’র সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি দেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দিন আহমদ, আবুল কাশেম, তাজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, অলি আহাদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম এবং নজরুল ইসলাম। কিন্তু জিন্নাহ খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে একপেশে এবং চাপের মুখে সম্পাদিত বলে প্রত্যাখান করেন। জিন্নাহ ছাত্র-নেতাদের সাথে ধমক দিয়ে কথা বলেন; যা ছিল তার রাজনৈতিক প্রধান ভুল। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য জিন্নাহর নিকট স্মারকলিপি পেশ করে। ২৮ মার্চ জিন্নাহ ঢাকা ত্যাগ করেন এবং সেদিন সন্ধ্যায় রেডিওতে দেয়া ভাষণে তাঁর পূর্বকার অবস্থানের কথাই পুনর্ব্যক্ত করেন। জিন্নাহর ঢাকা ত্যাগের পর তমুদ্দন মজলিসের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়; যেখানে তমুদ্দন মজলিসের আহ্বায়ক শামসুল আলম তার দায়িত্ব মোহাম্মদ তোয়াহা’র কাছে হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে তমুদ্দন মজলিস

আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করে একটি বিবৃতি প্রদান করেন।

১৯৫২ : ভাষা আন্দোলনের পুনর্জাগরণ

ভাষা আন্দোলনের মতো আবেগিক বিষয়ের পুণরায় জোরালো হওয়ার পেছনে ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিনের ভাষণ প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন খাজা নাজিমুদ্দিন ২৫ জানুয়ারি ঢাকায় আসেন এবং ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের এক জনসভায় দীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি মূলত জিন্মাহর কথারই পুনরুজ্জীবিত করে বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচারিত তাঁর ভাষণে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, কোনো জাতি দু'টি রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারেনি। নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯ জানুয়ারি প্রতিবাদ সভা এবং ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। সেদিন ছাত্রসহ নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরে তারা তাদের মিছিল নিয়ে বর্ধমান হাউসের (বর্তমান বাংলা একাডেমি) দিকে অগ্রসর হয়। পরদিন ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত সভায় মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ গঠিত হয় এবং ৩০ জানুয়ারির সভায় গৃহীত ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন দেয়া হয়। পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল, সমাবেশ ও মিছিলের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়। সমাবেশ থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবি জানানো হয়। ছাত্ররা তাদের সমাবেশ শেষে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

২০ ফেব্রুয়ারি সরকার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় এক মাসের জন্য সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্ন হলে সভা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়।

২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এ দিন সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়। তারা ১৪৪ ধারা জারির বিপক্ষে স্লোগান দিতে থাকে এবং পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যদের ভাষা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মতামতকে বিবেচনা করার আহ্বান জানাতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। ঐ সময় বিভিন্ন অনুযায়ী ডীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন। বেলা সোয়া এগারটার দিকে ছাত্ররা গেটে জড়ো হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। কিছু ছাত্র ঐ সময়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দিকে দৌড়ে চলে গেলেও বাকিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুলিশ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পুলিশের আত্মসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান

এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ছাত্ররা ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময় কয়েকজনকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার শুরু করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ঘটনায় ছাত্ররা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে পুণরায় তাদের বিক্ষোভ শুরু করে। বেলা ২টার দিকে আইন পরিষদের সদস্যরা আইনসভায় যোগ দিতে এলে ছাত্ররা তাদের বাধা দেয়। কিন্তু পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। তখন কিছু ছাত্র সিদ্ধান্ত নেয় তারা আইনসভায় গিয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করবে। ছাত্ররা এ উদ্দেশ্যে আইনসভার দিকে রওনা করলে বেলা ৩টার দিকে পুলিশ দৌড়ে এসে ছাত্রাবাসে গুলিবর্ষণ শুরু করে। পুলিশের গুলিবর্ষণে আব্দুল জব্বার এবং রফিক উদ্দিন আহমেদ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এছাড়া আব্দুস সালাম, আবুল বরকতসহ আরও অনেকে সেসময় নিহত হন। ঐ দিন অলিউল্লাহ নামের একজন ৮/৯ বছরের কিশোরও নিহত হয়।

ছাত্র হত্যার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে জনগণ ঘটনাস্থলে আসার উদ্যোগ নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অফিস, দোকান-পাট ও পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদের শুরু করা আন্দোলন সাথে সাথে জনমানুষের আন্দোলনে রূপ নেয়। ঐ সময় গণপরিষদে অধিবেশন শুরুর প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলির খবর জানতে পেরে মাওলানা তর্কবাগিশসহ বিরোধী দলীয় বেশ কয়েকজন অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ান।

পরবর্তী ঘটনা (১৯৫২)

২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর সরকার আন্দোলনের বিপক্ষে জোরালো অপপ্রচার চালাতে থাকে। তারা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকে যে, পাকিস্তানবিরোধীদের প্ররোচনায় ছাত্ররা পুলিশকে আক্রমণ করেছিল। তারা বিভিন্নভাবে তাদের এই প্রচার অব্যাহত রাখে। তারা সারাদেশে প্রচারণাপত্র বিলি করে। সংবাদপত্রগুলোকে তাদের ইচ্ছানুসারে সংবাদ পরিবেশনে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। পাশাপাশি ব্যাপক হারে সাধারণ জনগণ ও ছাত্র গ্রেফতার অব্যাহত রাখে। ২৫ ফেব্রুয়ারি আবুল বরকতের ভাই একটি হত্যা মামলা দায়ের করার চেষ্টা করলে, উপযুক্ত কাগজের অভাব দেখিয়ে সরকার মামলাটি গ্রহণ করেনি। রফিকউদ্দিন আহমদের পরিবার একই ধরনের একটি প্রচেষ্টা নিলে, ঐ একই কারণে তাও বাতিল হয়। ৮ এপ্রিল সরকার তদন্ত শুরু করে। কিন্তু এর প্রতিবেদনে মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের উপর গুলি করার কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ দেখাতে পারেনি। সরকারের প্রতিশ্রুত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ প্রত্যাখান করে। ১৪ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন সামনে চলে আসে। এ সমস্যা নিরসনের পক্ষে অনেক সদস্য মত প্রকাশ করলেও মুসলিম লীগের সদস্যরা এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়ের বিপক্ষে তারা ভোট দিলে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে তারা ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর গণপরিষদে বাংলা ভাষার পক্ষে কথা বলার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। ২৭ এপ্রিল বার সেমিনার হলে কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় কর্মপরিষদ একটি সেমিনার আহ্বান করে এবং সরকারের কাছে ২১-দফা দাবি উত্থাপন করে। ১৬ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুললে সেদিন ছাত্ররা সমাবেশ করে।

পরবর্তী ঘটনা (১৯৫৩-৫৬)

কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় কর্মপরিসদ ২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণে শহীদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবুর রহমানও দিবসটি পালনে সম্মত হন। ১৯৫৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের উদ্দেশ্যে প্রশাসনের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভাষা আন্দোলনের এক বছর পূর্তিতে সারা দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস পালিত হয়। অধিকাংশ অফিস, ব্যাংক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মানুষ প্রভাতফেরীতে যোগ দেন। হাজার হাজার মানুষ শোকের প্রতীক কালো ব্যাজ ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসে এবং মিছিল করে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে। সহিংসতা রোধের জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়। প্রায় লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে আরমানিটোলায় বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে এক-দফা দাবি জানানো হয়, ভাষার দাবির পাশাপাশি মাওলানা ভাসানীসহ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি উত্থাপন করা হয়। রেলওয়ের কর্মচারীরা ছাত্রদের দাবির সাথে একমত হয়ে ধর্মঘট পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ছাত্ররা শহীদদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। অন্যদিকে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ফজলুর রহমান বলেন যে, বাংলাকে যারা রাষ্ট্রভাষা করতে চায় তারা দেশদ্রোহী। তাঁর এ বক্তব্যে জনগণ হতাশ হয়ে তাঁকে কালো ব্যাজ দেখায়। সাধারণ মানুষের মাঝে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই লেখা সম্বলিত স্মারক ব্যাজ বিলি করা হয়। ভাষা সংগ্রাম কমিটি দিবসটি পালন উপলক্ষে সমাবেশ আহ্বান করে। আন্দোলনকে আরো বেগবান করার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিশেষ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভাষা আন্দোলনের মূল অনুপ্রেরণাদায়ী অমর সঙ্গীত আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো... ঐ বছর কবিতা আকারে লিফলেটে প্রকাশিত হয়। তবে ১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাদে কালো পতাকা উত্তোলনের সময় পুলিশ কিছু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে।

সংবিধান সংশোধন

১৯৫৪ সালের ৭ মে মুসলিম লীগের সমর্থনে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয় ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি। সংবিধানের ২১৪(১) অধ্যায়ে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে লেখা হয়- “The state language of Pakistan shall be Urdu and Bengali.” অর্থাৎ উর্দু এবং বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। যদিও আইয়ুব খানের প্রতিষ্ঠিত সামরিক সরকার উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল। ১৯৫৯ সালের ৬ জানুয়ারি সামরিক শাসকগোষ্ঠী এক সরকারি বিবৃতি জারি করে এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে উল্লেখিত দুই রাষ্ট্র ভাষার উপর সরকারি অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন

১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। পরে ৮ মার্চ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে

অন্যান্য দল মিলে যুক্তফ্রন্ট নামীয় একটি সমন্বিত বিরোধী রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে নেয়ামে ইসলাম, কৃষক শ্রমিক পার্টি, খেলাফত পার্টি সহ ছোট খাট আরো দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যার মধ্যে আরো ছিল বামপন্থী গণতন্ত্রী দলের নেতা ছিলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ এবং মাহমুদ আলি সিলেটী। যুক্তফ্রন্টের প্রধান তিন নেতা ছিলেন মাওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তফ্রন্ট যেন আন্দোলনের আর কোন সুযোগ না পায় সেজন্য মুসলিম লীগ তাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এমনকি নির্বাচনের প্রচারণাকালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী অনেকটা ধমকের সুরে বলেন নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, কোন ভাবেই পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে দেওয়া যাবে না। এই যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার একটি নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। ঐ ইশতেহারের মধ্যে প্রধান দাবি ছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা ইত্যাদি।

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের মার্চের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন অর্জন করে। তন্মধ্যে ১৪৩টি পেয়েছিল মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ৪৮টি পেয়েছিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামী ইসলাম পার্টি লাভ করেছিল ২২, গণতন্ত্রী দল লাভ করেছিল ১৩টি এবং খেলাফত-ই-রাব্বানী নামক দলটি ১টি আসন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ সম্পূর্ণরূপে এ নির্বাচনে পরাভূত হয়; তারা কেবল ৯টি আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। এ নির্বাচনে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ৭২টি আসন সংরক্ষিত ছিল। এগুলোর মধ্যে কংগ্রেস লাভ করেছিল ২৪টি আসন, কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি, শিডিউল্ড কাস্ট ফাউন্ডেশন ২৭টি, গণতন্ত্রী দল ৩টি এবং ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি ১৩টি আসন লাভ করেছিল। একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী একটি আসনে জয়ী হয়েছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার

১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক চার সদস্যবিশিষ্ট যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয় ১৫ মে তারিখে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। ১৯৫৪ সালের ৩১ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে দিয়ে শাসনতন্ত্রের ৯২(ক) ধারা জারির মাধ্যমে প্রদেশে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেন।

লেখক

কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

পাকিস্তান রাষ্ট্রে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন থেকে ৭০-এর নির্বাচন

শেখ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল করে জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা প্রথমে সামরিক শাসন জারি করেন। ২০ দিনের মাথায় তাঁকে উৎখাত করে আরেক সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন। শুরু হয় পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিকায়ন প্রক্রিয়া।

আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই পাকিস্তানের শাসন কাঠামো এবং রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর থেকে আইয়ুব খানের ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ বছরে পাকিস্তানে কোন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে কখনোই জাতীয়ভিত্তিক নির্বাচন কাঠামো নিশ্চিত হয়নি। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানে একটি নতুন ধরনের নির্বাচন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নির্বাচন প্রক্রিয়ার মূলভিত্তি ছিল, মৌলিক বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে, এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র, যাতে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু লোকের অধিকারে জাতীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার ছিল। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মন্ত্রিসভা ও প্রতিনিধি পরিষদসমূহের সর্বোতভাবে প্রেসিডেন্টের অধিনে থাকা এবং প্রাদেশিক বা অন্য কোন স্তরে স্বায়ত্তশাসনের অনুপস্থিতি। মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৯৫৯ সালের ৩০ এপ্রিল ও ১ মে করাচিতে অনুষ্ঠিত গভর্নরদের সম্মেলনে এবং ২৬ অক্টোবর ক্ষমতা গ্রহণের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মৌলিক গণতন্ত্র আইন প্রবর্তনের আদেশ জারি করা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্রের স্তরবিন্যাস

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ দ্বারা চার স্তরের পিরামিডভিত্তিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন চালু করা হয়। এ চারটি স্তর হচ্ছে-

১. ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রাম এলাকায়) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহর এলাকা)
২. থানা কাউন্সিল/ তহশিল কাউন্সিল
৩. জেলা কাউন্সিল
৪. বিভাগীয় কাউন্সিল

নির্বাচকমণ্ডলী

মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পাকিস্তানের উভয়াংশ থেকে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০টি নির্বাচনী ইউনিট দিয়ে দেশের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ১২৭০জন ভোটার নিয়ে একটি ইউনিট এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ১০৭২জন ভোটার নিয়ে একটি ইউনিট গঠিত হয়। এই ইউনিটের জন্য ১জন করে সদস্য নির্বাচিত হতেন। এই ইউনিটের নাম Electorail college, আর নির্বাচিত সদস্য মৌলিক গণতন্ত্রী (Basic Democracy Member) বা সংক্ষেপে বি. ডি মেম্বর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বি. ডি মেম্বরগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ছিলেন।

বি. ডি মেম্বরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. প্রেসিডেন্ট, প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট দেয়া।
২. স্থানীয় ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজ তত্ত্বাবধান করা।
৩. স্থানীয় সরকার ও রাষ্ট্র নির্ধারিত রাজস্ব ও কর সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করা।

আস্থা ভোট গ্রহণ

আইয়ুব খান তাঁর সামরিক শাসনকে বেসামরিক রূপদান ও জনগণ তাঁর সাথে আছে, এটা বুঝানোর জন্য মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ‘আস্থা ভোট গ্রহণ’ করেন। সামরিক আইনবিধি অনুযায়ী ভোটারদের হ্যাঁ/ না বলার সুযোগ ছিল এবং নির্বাচনে আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বি কোন প্রার্থী ছিলেন না। ফলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব উক্ত ব্যবস্থাপনার বিপুল ‘হ্যাঁ’ সূচক আস্থাভোট আদায়ে সক্ষম হন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার

সামরিক শাসন জারি হবার পর রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার এবং হয়রানি একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর মওলানা ভাসানী কারারুদ্ধ হলেন। ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ইন্ডোফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া গ্রেফতার হন। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হন।

সংবিধান প্রণয়ন ও নির্বাচন

১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান পাকিস্তানে নতুন সংবিধান জারি করেন এবং সংবিধান মোতাবেক ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ও ৬ মে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের মুসলিম জনমতের চাপে আইয়ুব খান ১৯৬২

সালের সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। সংবিধানে কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন পাস করা হবে না বলেও ঘোষণা করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়।

সামরিক শাসনের অবসান

৮ জুন সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে নব-নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে।

৬৫-এর নির্বাচন

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দিন ধার্য করা হয়। মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, নেজামে ইসলামসহ বিরোধী দলগুলো একব্যবন্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য 'সম্মিলিত বিরোধী দল' গঠন করে। সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়।

পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের ৬ অক্টোবর ভারত-পাকিস্তানের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের মূলকারণ ছিল, পাকিস্তান কর্তৃক ভারতশাসিত কাশ্মির অধিকার ও পাকিস্তানভূক্ত করা। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মিরের দুই-তৃতীয়াংশ এবং পাকিস্তান এক-তৃতীয়াংশ দখল করে। পাকিস্তান মুসলিম অধ্যুষিত হিসেবে সমগ্র কাশ্মিরের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে ১৯৪৭ সালে যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মিরে নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে। ১৯৬৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহায়তায় বেসরকারী মুজাহিদ বাহিনী ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরে প্রবেশ করে। ফলে ভারত পাকিস্তানের ওপর হামলা চালায়। সতের দিনের মাথায় জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বন্ধ হয়। এই যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সেনারা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেয়।

আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে নতুনমাত্রা

পাক-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে নতুনমাত্রা যোগ হয়। কারণ যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানসহ সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

৬ দফা দাবি উত্থাপন : পাক-ভারত যুদ্ধে পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট গণ-অসন্তোষের মধ্যেই ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ ৬ দফা দাবি প্রণয়ন করেন। এই দাবি উত্থাপনের পিছনে দুই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক বৈষম্য মূল ভূমিকা পালন করেছে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য হলেও পূর্ব পাকিস্তানকে লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হয়নি। উপরন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২০৫ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্বাঞ্চলে মাথাপিছু ব্যয়

ছিল ১৯০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ২৯২ টাকা। ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ব্যয় হয়েছিল ৯৭০ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২১৫০ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সালের পূর্বে প্রতি বছর জাতীয় আয়ের ২% পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে পাচার হতো। ৬ দফা উত্থাপনে সামরিক প্রেক্ষাপট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের সামরিক, নৌ এবং বিমান বাহিনীর সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বল্পসংখ্যক। সেনাবাহিনীতে বাঙালি সৈন্যের অনুপাত ছিল ৪% এবং প্রতি ৬০ অফিসারের মধ্যে একজন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান সামরিকভাবে প্রায় অরক্ষিত ছিল। সম্ভাব্য ভারত আক্রমণ প্রতিহত করার মতো কোনো শক্তি পূর্বাঞ্চলে ছিল না। এমতাবস্থায় সামরিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। তাই ৬ দফায় আঞ্চলিক আধাসামরিক বাহিনী গঠনের দাবি উত্থাপিত হয়।

৬ দফা দাবি

১ম দফা : শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নপূর্বক পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির। প্রাণ্ডবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলো হবে সার্বভৌম।

২য় দফা : কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্র (কেন্দ্রীয়) সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয় অঙ্গরাজ্যসমূহের হাতে থাকবে।

৩য় দফা : মুদ্রা ও অর্থব্যবস্থা

এ দফায় দেশের মুদ্রা চালু থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রার লেনদেন হিসাব রাখার জন্য দু'অঞ্চলে দু'টি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। অথবা দু'অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। তবে শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চল মুদ্রা মূলধন অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে। এ ব্যবস্থায় পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দু'অঞ্চলের জন্য দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪র্থ দফা : রাজস্ব, কর ও শুল্কবিষয়ক ক্ষমতা

সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। শাসনতন্ত্রে এ ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর বিধান থাকবে।

৫ম দফা : বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য

বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে প্রদেশগুলো যুক্তিযুক্ত হারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাতে।

৬ দফা : প্রতিরক্ষা

আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রদেশগুলোকে নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে।

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির সভায় ছয়দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। কাউন্সিল অধিবেশন হয় ১৮, ১৯ মার্চ এবং এ সভায় ছয়দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়।

মূলত ছয় দফা ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই স্বায়ত্তশাসনের দাবি। ছয় দফার প্রথম ও দ্বিতীয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফা ছিল পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার দাবি। ষষ্ঠ দফা ছিল পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি। ৬ দফার কোথাও স্বাধীনতার কথা ছিল না। বরং ১৯৬৮ সালের ২২ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির জরুরি সভায় ৬ দফকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার একমাত্র ভিত্তি বলে উল্লেখ করা হয়।

পি, ডি, এম গঠন : স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি ও স্বায়ত্তশাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে ৫টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল গঠিত হয় 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (পি.ডি.এম)। পি ডি এম আট দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দাবির ভিত্তিতে ৮ দফা প্রণীত হয়। পি.ডি.এম-এর দাবিসমূহের মাঝে অন্যতম দাবি ছিল, ইসলামবিরোধী আইন বাতিল করা ও শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা।

আগরতলা ষড়যন্ত্র

পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যখন ব্যাপক আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। তখন আন্দোলনকে দমন করার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এক ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করেন। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ২জন সি.এস.পি অফিসারসহ ২৮ জন সামরিক বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'পূর্ব পাকিস্তানকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করার' ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অপরাধে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে। ১৮ জানুয়ারি 'ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও পরিচালনার' অভিযোগ এনে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে পূর্বের ২৮ জনসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়। এটাই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত।

মামলার প্রতিক্রিয়া

আগরতলা মামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমে উত্তপ্ত হতে থাকে। ১৯৬৮ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ মামলার জেরার কাজ চলে। এ সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বে শূন্যতা দেখা দেয় আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব গ্রহণ করেন পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন

সরকারবিরোধী আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে ‘ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। ১৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহত সাধারণ ছাত্র সভায় এগারো দফা কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।

ডাক গঠন : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ক্রমান্বয়ে জোরদার হতে থাকে। সমগ্র দেশবাসীকে গণআন্দোলনে সম্পৃক্ত করে আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগসহ ৮টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ‘ডেমোক্রাটিক কমিটি অব এ্যাকশন’ (সংক্ষেপে ‘ডাক’) গঠিত হয়। ডাক-এর ঘোষণাপত্রে আইয়ুব খানকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে ৮ দফা দাবি উত্থাপন করে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের ডাক দেয়।

ডাক-এর ৮ দফা

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার।
২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন।
৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা ঘোষণা।
৪. নাগরিক স্বাধীনতা পুনর্বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল। বিশেষত বিনাবিচারে আটক আইনসমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল।
৫. সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও দায়েরকৃত সকল রাজনৈতিক মামলা সংক্রান্ত গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার।
৬. ১৪৪ ধারা মোতাবেক সর্বপ্রকার আদেশ প্রত্যাহার।
৭. শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল।
৮. নতুন ডিক্লারেশনসহ সংবাদ পত্রের ওপর আরোপিত সকল বিধি-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্ত সকল প্রেস, পত্রিকা ও সাময়িকী পুনঃবহাল।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা এবং ‘ডাক’-এর ৮ দফাভিত্তিক আন্দোলনের চাপে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী এক গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়। ‘ডাক’ ও ‘ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ ১৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী দাবি দিবস পালনের ঘোষণা করে। ১৪৪ ধারা অমান্য করে ছাত্ররা মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশের লাঠিচার্জে বহু ছাত্র আহত হয়। এরপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি থেকে প্রতিদিন বিক্ষোভ চলতে থাকে। আন্দোলন চলাকালে ২০ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে ছাত্র আসাদুজ্জামান এবং ২৪ জানুয়ারি স্কুল ছাত্র মতিউর রহমান নিহত হন। ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে আগরতলা মামলার বিচারাবধীন আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত হন। জহুরুল হকের হত্যার প্রতিবাদে দেশে সহিংস আন্দোলন গড়ে উঠে। সরকার আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ১৬ ফেব্রুয়ারি সারা ঢাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি কারফিউ জারি করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে

গুলি করে হত্যা করে। এই মৃত্যু সংবাদ গণআন্দোলনে নতুনমাত্রা যোগ করে। আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় পাকিস্তান সরকার নমনীয় হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে আইয়ুব খান পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ার ঘোষণা দেন এবং ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি দেয়।

গোলটেবিল বৈঠক : আইয়ুববিরোধী আন্দোলন চলাকালে ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। শেখ মুজিবুর রহমান কারামুক্ত হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট ভবনে রাজনৈতিক সংকট উত্তরণকল্পে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। দীর্ঘ মূলতবীর পর ১০ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক পুনরায় শুরু হয়। বৈঠক ‘ডাক’-এর আহবায়ক নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান কমিটির পক্ষ থেকে দুইটি দাবী উত্থাপন করেন। ১. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতি সরকার। ২. প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদ নির্বাচন। ১০ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত বৈঠক চলে। ১৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বয়স্কদের ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি পদ্ধতি সরকারের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয়াংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। দেশের ও সমাজ জীবনের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। দেশের এমন নাজুক পরিস্থিতিতে ১৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান দেশ শাসনে তার অপারগতার কথা ঘোষণা করেন। ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারণ করে তাঁর পরিবর্তে এম.এন হুদাকে নিয়োগ করেন। ২২ মার্চের পর পূর্ব পাকিস্তানে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। অবশেষে ২৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন একজন সামরিক জাঙ্গা হিসেবে। তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি ও সংবিধান স্থগিত করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর এক ভাষণে নিম্নোক্ত ঘোষণা দেন।

ক. প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন। খ. ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমোদন গ. নতুন সংবিধান রচনা ও সংবিধান রচনা পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ এবং ঘ. ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়।

আইনগত কাঠামো আদেশ

ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ নির্বাচন সংক্রান্ত আইনগত কাঠামো আদেশ বা লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক ওয়ার্ডার ঘোষণা করেন। আইনগত কাঠামো আদেশে ভবিষ্যতের সংবিধান সম্বন্ধে যথেষ্ট দিকনির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়। এ আদেশের

২০নং ধারায় সংবিধানে মূল ৬টি নীতি বেঁধে দেয়া হয়।

যথা- ১. ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ২. ইসলামী আদর্শ হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি ৩. প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন। ৪. মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে ৫. বিভিন্ন এলাকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য।

ঘূর্ণিঝড় : ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর জলোচ্ছ্বাসে হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও ভোলাসহ উপকূলবর্তী এলাকার ২০ লক্ষ অধিবাসীর প্রাণহানি ঘটে। ঘূর্ণিঝড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছিল অপ্রতুল। পাকিস্তানের শাসকবর্গ এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচারে এটাকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ব্যবহার করে।

‘স্বাধীনতা’ না ‘স্বায়ত্তশাসন’ : ৭০ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের মাঝে স্বাধীনতা না শায়ত্বশাসন-এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। মওলানা ভাসানী ২৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ‘স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের’ আওয়াজ প্রকাশ্যে উত্থাপন করেন। অন্যদিকে ২৬ নভেম্বর ঢাকায় এক প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, “আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইয়াছি’ স্বাধীনতার নয়।”

১৯৭০ সালের নির্বাচন

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা : ১৯৬৯ সালের ২ জুলাই ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের একজন বাঙালি বিচারক বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এ নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক কাজ ছিল একটি সর্বজনীন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা। কমিশন সাফল্যের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করেন। তালিকাভুক্ত ভোটারের মধ্যে ৩,১২,১৪,৯৩৫ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের এবং ২,৫২,০৬,২৬৩ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। এ ভোটার তালিকায় উপজাতীয় অধিবাসীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ২৪টি দল অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তানের দুই অংশে সংরক্ষিত ১৩টি আসনসহ মোট ৩১৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ছিলেন সর্বমোট ১৮৬৮ জন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার পক্ষে প্রচারাভিযানে নামেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি মুসলমানদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে বিবেচনায় নিয়ে তিনি ইসলামী আদর্শের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ঘোষণা দেন, “ইসলাম হচ্ছে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের গভীরভাবে লালিত বিশ্বাস। আওয়ামী লীগ দৃঢ়তার সাথে নিশ্চয়তা দেয় যে, শাসনতন্ত্রে এটা পরিষ্কারভাবে নিশ্চয়তা থাকবে যে, ইসলামী আদর্শ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে যেমনটা আছে তার বিপরীত কোনো আইনই পাকিস্তানে কার্যকর কিংবা চালু করা হবে না।” বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের ২য় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৭০-এর নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ সাংবিধানিক কমিটি পাকিস্তানের জন্য ইসলামী আদর্শভিত্তিক একটা খসড়া সংবিধান তৈরি করেছিল। এতে স্পষ্ট হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি

ইসলামী আদর্শভিত্তিক সংবিধান প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি পেয়েই আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। নির্বাচনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি.পি.পি) ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের মাঝে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

নির্বাচনের ফলাফল

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ভুট্টোর পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন লাভ করে দ্বিতীয় হয়। অন্যান্য দলের মধ্যে মুসলিম লীগ ৯টি, মুসলিম উলামা (খানভী) ৭টি, ন্যাপ (ওয়ালি খান) ৭টি, জামায়াতে ইসলামী ৪টি, মুসলিম লীগ (কনভেনশান) ২টি, পি.ডি.পি ১টি এবং স্বতন্ত্র ১৪টি আসন পায়। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে বামপন্থী দলগুলো ভোট পেয়েছে ২%, আওয়ামী লীগ পেয়েছে ৮৭% ও ইসলামী দলগুলো পেয়েছে ১৩% ভোট। প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের লক্ষণীয় বিষয় ছিল, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পি.পি.পি পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি। অর্থাৎ কোনো দলই নিখিল পাকিস্তান পার্টির মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। যার ফলে জুলফিকার আলী ভুট্টোর বলতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। আর কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ফর্মুলা বের করা হোক।

আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস ঘোষণা

আওয়ামী লীগ ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ বিজয় দিবস ঘোষণা করে। বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা রেসকোর্সে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রকাশ্য শপথ পাঠ করান। শেখ মুজিব ‘করণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে’ বলে শপথ শুরু করেন আর আল্লাহ আমাদের সহায় হোন এবং ‘জয় বাংলা- জয় পাকিস্তান’ বলে শেষ করেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি

নির্বাচনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া ‘আইনগত কাঠামোর’ মোতাবেক ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে গড়িমসি করেন। অনেক গড়িমসির পর ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় আহ্বান করেন। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর দাবির প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ দুপুর ১টা ৫ মিনিটে এক বেতার ভাষণের মাধ্যমে ৩ মার্চ ঢাকায় আহত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী করেন।

জাতীয় পরিষদের মূলতবী ঘোষণার সাথে সাথে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষুব্ধ জনতা বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানী সেনাদের আক্রমণ করে। নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আসম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ ছাত্রনেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে ‘স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। ২ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় যা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন

আহ্বান করেন। ৭ মার্চ রেসকোর্সে ময়দানে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিম্নোক্ত শর্তারোপ করেন-

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করা।
২. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া।
৩. হত্যার তদন্ত করা।
৪. জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

৭ মার্চে শেখ মুজিবের আহবানে সাড়া দিয়ে পরদিন থেকে দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। ৭ মার্চ লে. জে. সাহেবজাদা এয়াকুবের স্থলে কঠোরমনা লে. জে টিক্কা খান গভর্নর হিসেবে ঢাকায় আগমন করেন। ১৩ মার্চ সরকার পুণরায় সামরিক আইন জারি করে।

১৫ মার্চ রাজনৈতিক সংকট নিরসনকল্পে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমান কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। ২১ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইয়াহিয়া মুজিবের বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজ্য খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করেন। তাতে বলা হয়, “আমাদের সংবিধানে এমন গ্যারান্টি থাকবে যার ফলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পাকিস্তানের মুসলমানগণ পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ বিধৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারেন।”

যাই হোক, আলোচনা চলাকালীন ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে নিরীহ মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের হামলা ও হত্যা আলোচনাকে ব্যর্থ করে দেয়। আলোচনাকে অসমাপ্ত রেখেই সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র জনতার ওপর হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়ে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। আর সে রাতেই এ জাতির ওপর নেমে আসে চরম আঘাত। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৫৮ থেকে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়-

১. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলে ছিল শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য। এই শোষণ ও বৈষম্যের কারণে ধর্মীয় বন্ধন থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। বরং পশ্চিম পাকিস্তানীরা সবসময় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের ন্যায়্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। তারা কখনো এদেশের জনগণকে আপন করে নিতে পারেনি। ভৌগলিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার মাইল। যার সবটাই ছিল ভারতের ওপর দিয়ে। পাকিস্তানের উভয়াংশের মাঝে এই ভৌগলিক দূরত্ব মানসিক দূরত্ব সৃষ্টিতে প্রভাব রেখেছিল।

২. পাকিস্তানের শাসকগণ যদি ইসলামী খেলাফতের বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন চেতনাকে ধারণ করে সাম্য ও সুবিচারের নীতি অবলম্বন করত তাহলে ইতিহাস হয়তো ভিন্নরকম হতো। পাকিস্তান সৃষ্টিতে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অবদানই বেশি ছিল।

৩. পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমাদের কোন আদর্শের লড়াই ছিল না। ছিল অধিকার আদায়ের লড়াই। শিক্ষার অধিকার, ভাষার অধিকার, চাকরি, ব্যবসায় ও সমতার অধিকার। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে কারণে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়েছি সেখানে ইসলাম প্রশ্নটি কোনভাবেই জড়িত ছিল না। ৭১-এ আমাদের সংগ্রাম ছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য, ইসলাম থেকে নয়।

৪. ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল- সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার। মুজিবনগর সরকারের ঘোষণাপত্রে এগুলোকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ৭১-এ এদেশের জনগণ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

৫. বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলা হয়, তা কখনোই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হতে পারে না। ৬৬-এর ৬ দফা, ৭০ সালের আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার, ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা ছিল না। বরং আমরা দেখেছি, ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী প্রচার ও নির্বাচনী ইশতেহারে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের কথা ছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না। এমন নিশ্চয়তা পেয়েই ৭০ সালে এদেশের মুসলমানগণ তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামীলীগকে ভোট দেয়। তাহলে প্রশ্ন হল, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হল?

মূলত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ভারতের সংবিধানের আদর্শ। আর সমাজতন্ত্র তৎকালীন রাশিয়ার আদর্শ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, “বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে”। এর কারণ হিসেবে তিনি জানান, বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে গ্রহণ করেছে।

মজার ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় পার্লামেন্টেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতি স্থির হওয়ার কথা। কিন্তু এর এক বছর আগেই এবং ভারতের মাটিতে অবস্থানকালেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলনীতিরূপে গ্রহণ, ‘ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার শামিল।’

সহায়ক গ্রন্থ

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী- শেখ মুজিবুর রহমান
২. পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর- তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র ২য় খণ্ড- হাসান হাফিজ সম্পাদিত
৪. বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯০৫-১৯৭১- ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
৫. জাতীয় রাজনীতি- ১৯৪৫ থেকে ৭৫- অলি আহাদ
৬. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর- আবুল মনসুর আহমদ
৭. রাজনীতির তিনকাল- মিজানুর রহমান চৌধুরী

লেখক

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক

Bmjvgx kvmbZŠ; QvÍ Av†`vjb

স্বাধীনতায়ুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

মুহাম্মাদ জিয়াউল হক জিয়া

বঙ্গোপসাগরের সর্বনাশা স্রোতের প্রতিকূলে বাংলাদেশের অবস্থানে নানা প্রতিকূলতার মাঝে কিভাবে বেঁচে থাকতে হয় বাঙালিরা তা ভাল করেই জানে। সংগ্রামই হল তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র মাধ্যম। ঔপনিবেশিকদের নিকট হতে মুক্তির জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে, জন্ম দিয়েছে নতুন নতুন ইতিহাসের। ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হলে মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী শাসকমহলের দূরদর্শীতার অভাব ও বাঙালিদের প্রতি অবহেলা, জুলুম, অত্যাচার প্রভৃতি বাঙালিদেরকে আবার সংগঠিত করতে থাকে। যার প্রমাণ আমরা ১৯৫২, ৫৪, ৬২, ৬৫, ৬৯, ৭০ সর্বোপরি ১৯৭১ সালের ইতিহাসে দেখতে পাই। ১৯৭১ সালে বাঙালিরা পাকিস্তানের জালিম শাসকগোষ্ঠীকে বিদায় করতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলে। এ সংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের জনতার স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল অনস্বীকার্য। বাংলার সর্বস্তরের জনতার স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ যদি না থাকত তাহলে মাত্র ৯ মাসের ব্যবধানে বাংলার স্বাধীনতার লাল টুকটুকে সূর্যের দেখা আমরা পেতাম না। তাই কোন ব্যক্তি বা দল যদি বলে বাংলার স্বাধীনতা তাদের স্বতন্ত্র অর্জিত সম্পত্তি তাহলে এ দাবি স্বতসিদ্ধ হবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ সালে সংঘটিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্র আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে একটি জনযুদ্ধের আদলে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি

সামরিক জাভা ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ হত্যা করে। গ্রেফতার করা হয় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে সারাদেশে গুরু হয়ে যায় প্রতিরোধযুদ্ধ; জীবন বাঁচাতে প্রায় ১ কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ, সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কজা থেকে মুক্ত করতে কয়েক মাসের মধ্যে গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী সারাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইতোমধ্যে পর্যাপ্ত ও হতোদ্যম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান ৯৩,০০০ হাজার সৈন্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এরই মাধ্যমে নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি জাতির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। অবশ্য বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের পথে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালের বাংলার স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা আলোচনা করার সুবিধার্থে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রধানত ৩টি ভাগে ধারাবাহিক আলোচনা করব।

১. আওয়ামী লীগের ভূমিকা : ১৯৪৯ সালে মুসলিমলীগের বিরোধিতা করতে গিয়ে ও পূর্ব বাংলার যথার্থ অধিকার আদায় করতে গিয়ে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় আওয়ামী মুসলিমলীগ নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মওলানা ভাসানী ছিলেন এ দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলিমলীগ থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেওয়া এবং নীতি-নির্ধারণী নিয়ে মওলানা ভাসানীর সাথে মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি আওয়ামী মুসলিমলীগ ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেন। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ এর নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। ফলে পূর্ব প্রস্তুত আন্দোলনের নেতৃত্বে তখন আওয়ামী লীগ জয়গা করে নেয়।

১ম পর্যায়ে আওয়ামী লীগ

ক. মুজিবনগর সরকার গঠন : মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হলে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের ১ম পদক্ষেপ হিসেবে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ প্রবাসী অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় কর্নেল আতাউল গণি ওসমানিকে (স্বাধীনতার পর তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হন)।

খ. যুব অভ্যর্থনা কেন্দ্র গঠন : মুজিবনগর সরকার দেশের সীমান্ত অঞ্চলে যুব অভ্যর্থনা কেন্দ্র গঠন করে। দেশের যুব সমাজকে যুদ্ধে অংশগ্রহণকল্পে ভারতীয় সহযোগিতায় সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে থাকে।

গ. জেলায় জেলায় প্রতিরোধ কমিটি গঠন : আওয়ামী লীগ জনগণকে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য জেলায় জেলায় তাদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে এবং তাদের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়।

২য় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ

এ পর্যায়ে আওয়ামী সমর্থক ছাত্রনেতারা শেখ মুজিবের সমর্থক দল হিসেবে মুজিব বাহিনী গঠন করে। যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছিলেন আ. রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খান। মুজিব সমর্থক টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী কাদেরিয়া বাহিনী গঠন করে গেরিলা পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধে লড়ে পাক হানাদারদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। কাদেরিয়া বাহিনী পাকিস্তানীদের নিকট টাইগার বাহিনী নামে পরিচিত ছিল। এর সদস্য ছিল প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার)।

কূটনৈতিক তৎপরতা : আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী সরকার বৈদেশিক সমর্থন লাভের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায় এবং পাকিস্তান বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার কথা তাদের নিকট তুলে ধরে। তাছাড়া জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করার জন্য প্রতিনিধি দল হিসেবে মোজাফফর আহমদ ও মাহবুব আলমকে প্রেরণ করে।

২. মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী দল গুলোর ভূমিকা : মুক্তিযুদ্ধ শুরু সময় বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলো দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী।

ক. মস্কোপন্থী বাম দলের ভূমিকা : এ দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে দু'ভাগে অংশগ্রহণ করে।

১. মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে তাদের প্রায় ৬০০০ সদস্য বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

২. স্পেশাল গেরিলা বাহিনী গঠনের মাধ্যমে প্রায় ২০০০ সদস্য ঢাকা ও কুমিল্লায় যুদ্ধ করে। এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মতিয়া-মোজাফফরসহ কতিপয় বাম নেতা। তারা ১টি দলকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেছিল। কিন্তু তারা ফিরে আসার আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এ দলগুলো ১টি NLF গঠনের প্রস্তাব করলে বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার প্রথমে তার বিরোধীতা করলেও ৯ সেপ্টেম্বর উপদেষ্টা কমিটি গঠনে সম্মতি জানায়। মওলানা ভাসানী এর সভাপতি ছিলেন।

খ. পিকিংপন্থী বাম দলগুলোর ভূমিকা : মস্কোপন্থী বামদলগুলো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও পিকিংপন্থী দলগুলো মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মওলানা ভাসানী দেশ, জাতির কথা চিন্তা করে ভারতে চলে যান এবং ন্যাপ, CCCR, CWA, BCP, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন-বাশার)-এ দলগুলো নিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামে সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। আর মওলানা ভাসানী ছিলেন এ কমিটির সভাপতি।

৪. দক্ষিণপন্থী বা ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা : মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে দক্ষিণ বা ডানপন্থী দলগুলো হল : মুসলিমলীগ, নেজামে ইসলামী, পিডিপি,

জমিয়াত-ই-উল্লামায়ে ইসলাম, খেলাফতে রব্বানী পার্টি ইত্যাদি। মুসলিম লীগ ছাড়া উল্লেখিত অন্যান্য দলগুলো ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের সাথে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু অনেক আলেম-উলামারা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে মুক্তিবাহিনীকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। মুক্তিযুদ্ধে আলেমদের ভূমিকা সম্পর্কে তৎকালীন বাংলার বাঘ মোহাম্মদ উল্যাহ হাফেজী হুজুর রহ.-এর কথা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মরহুম পীর সাহেব চরমোনাই রহ. তাঁর এলাকার মুক্তিবাহিনীকে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করেন। হাফেজী হুজুর রহ.-কে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, “এটা মুসলমান-মুসলমান যুদ্ধ নয়, এটা হচ্ছে জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের যুদ্ধ”। তার এ কথার ভিত্তিতে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

৫. জামায়াতে ইসলামী’র ভূমিকা : জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করে পূর্ণ সহযোগিতা করে। যাদের ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গ্রামে গ্রামে শান্তি কমিটি, রাজাকার বাহিনী, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী গড়ে তোলার অভিযোগ ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, একটি দেশকে যদি স্বাধীনতার সূর্য মুকুট পেতে হয় তাহলে তাতে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ালীগ নেতৃত্বে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাংলার সর্বস্তরের জনসাধারণ এতে অংশগ্রহণ না করলে আমরা আজ লাল সবুজের পতাকা উড়াতে পারতাম না। কিছু দক্ষিণপন্থী দলের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত ভুলের কথা বলে সকল ইসলামী দল তথা আলেম, ওলামাদের মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণ ও তাদের অবদানকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলাদেশের ইতিহাস- ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য
২. বাংলাদেশের ইতিহাস- ড. আবু মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসেন
৩. বাংলাদেশের ইতিহাস- ড. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান।
৪. স্বাধীনতার দলিল পত্র- হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত

লেখক

কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৭৫)

আ হ ম আলাউদ্দীন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টা। রমনা রেসকোর্স উদ্যানে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন দুই জেনারেল। এর মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটলো আর সূচিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয়।

শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাক-সরকার মুক্তি দিলে পি আই এর একটি জেট বিমানে শেখ মুজিব লন্ডনে এসে পৌঁছান। সেখানে জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং বৃটিশ নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। ফেব্রার পথে দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। ১০ জানুয়ারি তিনি ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দানে ট্রাকযোগে অতিক্রম করেন। এ সময় জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে অভূতপূর্ব অভিনন্দন জানায়। সে দিন রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত সংবর্ধনায় তিনি বলেছিলেন আমি একজন মুসলমান। মৃত্যু আমার একবারই হবে। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ।

স্বাধীনতা সনদ

যুদ্ধকালীন সময়ে এবং যুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এটিই ছিলো দেশের সংবিধান।

ভারত-বাংলাদেশের ২৫ বছরের চুক্তি

১৭ মার্চ ১৯৭২ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ডাকায় আসেন। ১৯ মার্চ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যুক্ত ইশতেহার প্রকাশ করেন

এবং ২৫ বৎসর মেয়াদী “বন্ধুত্ব সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি” স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিকে তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দাসত্ব চুক্তি বলে অভিহিত করেন এবং স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব খর্বকারী সামরিক চুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। কারণ ১৯৫৪ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের “পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি”র অনুরূপই ছিল এই চুক্তিটি। সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ এই চুক্তির বিরোধীতা করেছিল।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই ২৭ মার্চ ১৯৭২ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অবাধ বাণিজ্য চুক্তি নামে আরেকটি অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বাস্তবে ভারতের বাজারে পরিণত হয়। মাওলানা ভাসানীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় হয়ে উঠে। ফলে জনমতের চাপে ১৯৭৩ সালে সরকার অবাধ সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সীমান্তে সংঘবদ্ধ চোরাকারবারী ও দুর্নীতি জাতীয় জীবনে অনুপ্রবেশ করে।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

মুক্তিযোদ্ধা, মুজিব বাহিনী এবং ষোড়শ বাহিনীর সদস্য কিংবা রাজাকার, আলবদর, আলশামস সকলের কাছেই ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। অস্ত্রের জোরে নিজ নিজ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে চলেছিলেন এসব বাহিনীর সদস্যরা। ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিব নির্দেশ দেন সকল মুক্তিযোদ্ধাকে ১০ দিনের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার মহকুমা অফিসারের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করার। নিজেদের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে তারা এই নির্দেশকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে তোলে। দেশ গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের চাইতে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রাধান্য দেয়ায় তাদের মাঝে হতাশা সৃষ্ট হয়। হতাশা থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এসময় যুদ্ধ বিরোধী শক্তিও পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড চালায়। ৭২ সালে হাইজ্যাক, ডাকাতি, পুলিশ ফাঁড়ি- বাজার লুট, অপহরণ, গুপ্তহত্যার মাধ্যমে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটানো হয়। ব্যাংক ডাকাতি হয় ৩১টি, গুপ্তহত্যা ১,৪৬৭টি, ডাকাতি ২ হাজার এবং ছিনতাই হয় ১৭ হাজার। (বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড-৩৮)

মুজিববাদ ও জাসদের জন্ম

৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমদ প্রথম শাসকদলের দর্শন হিসেবে মুজিববাদের কথা প্রকাশ করেন। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করে একে বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটিকে প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপ্লব গুরুত্বপূর্ণ আহবান জানানো হয়।

মুজিববাদ নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যে সংকট ও বিভক্তি দেখা দেয়। ছাত্রলীগের আ.স.ম আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দেন। বিভক্তি থেকেই ৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জন্ম হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর। এই দল শেখ মুজিবের সরকারকে বুর্জোয়া শোষণ শ্রেণির সরকার বলে ঘোষণা করে। সরকার বিরোধী গণবিক্ষোভকে পুঁজি করে জাসদ দ্রুত একটি শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সামর্থ্য হয়। নিষিদ্ধ ঘোষিত ডানপন্থি

দলগুলোর নেতা-কর্মীরা এসময় জািসদের জনসভায় যোগ দিয়ে জনসভার আয়তন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। রাজনীতিতে সাড়া জাগানো এই দলটি তাদের হটকারী ও জঙ্গি কর্মসূচি এবং উগ্র রাজনীতির কারণে রাজনীতিতে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়।

ব্যাংক, বীমা সংস্থা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ

২৫ মার্চ ১৯৭২ স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকীর দিনে দেশের পাট, বস্ত্র, চিনিকল, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করে আইন পাস করা হয়। এর মাধ্যমে সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ অযোগ্য প্রশাসক ও শ্রমিক নেতৃত্বের যোগসাজসে কারখানা লুটপাটের আঁখড়ায় পরিণিত হয়।

দ্রাণ ও পূর্ববাসন কর্মসূচি

স্বাধীনতা অর্জনের পর সরকারের দু'টি বড় চ্যালেঞ্জ মোকবেলা করতে হয়। (১) পূর্ববাসন (২) পূর্ণনির্মাণ। দ্রাণ ও পূর্ববাসনের জন্য কমিটি করে সারাদেশে দ্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে।

সংবিধান প্রণয়ন

১০ এপ্রিল ১৯৭২ এক বৈঠকে ৩৪ সদস্যের একটি সাংবিধানিক কমিটি করা হয়। ৪ নভেম্বর নতুন প্রণীত সংবিধানটি গৃহীত হয়। যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ঐ সময়ে নতুন সাংবিধানিক পরিষদ গঠনের কথা জানিয়েছিল।

এই সংবিধানে চারটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ তার রাজনীতির পঞ্চাশ বছর গ্রন্থে বলেন, “প্রস্তাবনায় তাঁরাও বলিয়াছেন : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শই আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রণোদিত করিত উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তথ্য হিসাবে কথাটা ঠিক না। আওয়ামী লীগের ছয়দফা ও সর্বদলীয় ছাত্র এ্যাকশন কমিটির এগার দফার দাবিতেই আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম শুরু হয়। এইসব দফার কোনটিতেই এসব আদর্শের উল্লেখ ছিল না। ঐ দুইটি দফা ছাড়া আওয়ামী লীগের একটি মেনিফেস্টো ছিল। তাতেও ওসব আদর্শের উল্লেখ নাই।”

সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলকে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতির আশ্রয় ও দলীয় বাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অভিযোগ আনে বিরোধী দলগুলো। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার-

আওয়ামীলীগ ৭৩.১৬%

ন্যাপ ৮.৩২%

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৬.৫২%

ন্যাপ (ভাসানী) ৫.৩২%

জাতীয় লীগ ০.৩৩%

স্বতন্ত্র ৫.২৫%

বাকশাল গঠন

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি এক অধ্যাদেশ বলে বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ) গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২৯ মে আওয়ামীলীগ, সিপিবি ও ন্যাপ মোজাফফর ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠন করেছিলেন। বাকশাল গঠনের মূল প্ররোচণায় ছিল ত্রিদলীয় ঐক্যজোট। এ জন্য যে শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী আনা হয়েছিল তা চতুর্থ সংশোধনী নামে পরিচিত। সে অনুযায়ী সকল বিরোধী দলসমূহকে বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং বাংলা জাতীয় লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও ইউনাইটেড পিপলস পার্টি অফিস তালাবদ্ধ করা হয়। সকল সংসদীয় সদস্যকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে বাকশালে যোগদান অন্ত্যায় সংসদ সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করা হয়।

বিরোধী মতগুলো এই ব্যবস্থাকে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করে বলেছিলেন যে, বাকশাল ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

অপরদিকে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, সুখ-সমৃদ্ধির, শান্তি-শৃঙ্খলার প্রথম শর্ত জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য প্রচেষ্টায় বাকশাল গঠন করা হয়েছিল বলে তারা দাবি করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের হত্যার সাথে সাথে এই ব্যবস্থার পতন হয়।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেশ এক মহাসংকটের কবলে নিপতিত হয়। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খাদ্য সংগ্রহ অভিযান ব্যর্থ হলে সরকারের খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি সংকটের সম্মুখীন হয়। এই দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয় ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের বুকে একের পর এক বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়লীলা এবং যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবস্থা, সারা বিশ্বে খাদ্য সংকট, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, চাউলের আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি, খাদ্য পাচার ইত্যাদি। কিন্তু বিরোধী মহল সরকারের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অবহেলা ও উদাসীনতাকে দায়ী করে দুর্ভিক্ষকে কৃতিমভাবে সৃষ্ট বলে দাবি করেন। তারা ব্যাপক হারে খাদ্য চোরাচালান দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

১৯৭১-৭২ সালে যে চালের মণ ছিল ৫৭.১০ টাকা ১৯৭৪-৭৫ সালে তা উন্নীত হয় ২৪৪.৪০ টাকায়। এভাবে প্রায় সকল সামগ্রী ৩০০% থেকে ৪০০% বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রব্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে দুর্ভিক্ষের আক্রমণ ছিল প্রবল। মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় মিষ্টি আলু, কচু, কলার খোড়, চালের কুড়া, ভাতের মাড় ও নানারকম লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছিল।

১৫ আগস্ট অধ্যায়

সেনাবাহিনীর অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল রশীদে নেতৃত্বে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্ব-পরিবারে হত্যা করা হয়।

এই দিনে নিহত হন- বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ আবু নাসের, সুলতানা কামাল খুকু, পারভীন জামাল রোজী, আব্দুর

রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মণি, বেগম আরজু মণি, কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ, বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, শহীদ সেরনিয়াবাত, আব্দুল নঈম খান রিন্টু।

বিভিন্ন মহলের ভূমিকা

সরকার গঠন

আওয়ামীলীগেরই একটি অংশ সে দিন মন্ত্রিসভা গঠন করে। এদের মধ্যে ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, মুহম্মদউল্যাহ, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, আ. ইউসুফ আলী, ফনীভূষণ মজুমদার, মো. সোহরাব হোসেন, আ. মান্নান, মনোরঞ্জন ধর, আ. মোমিন, আসাদুজ্জামান খান, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, ডা. ক্ষীতিশ চন্দ্র মণ্ডলসহ অনেকে। জেনারেল ওসামানী মন্ত্রিসভায় যোগ দেন ২৪ আগস্ট।

ভারতের প্রতিক্রিয়া

ভারতীয় সরকারী মুখপাত্র আগস্টের পরিবর্তন সম্পর্কে বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিধারার প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর না হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এইগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

মাওলানা ভাসানী

মাওলানা ভাসানী এই বিপ্লবকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আখ্যায়িত করে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

হাজী দানেশের অভিনন্দন

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ এক বিবৃতিতে হাজী মোহাম্মদ দানেশ খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে ধন্যবাদ এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি অভিনন্দন জানান।

মুজিব শাসনের সফলতা

১. যুদ্ধকালীন বিভিন্ন বাহিনী ও গ্রুপের নিকট থেকে শান্তিপূর্ণভাবে অস্ত্র সমর্পণ মুজিবের শিখরস্পর্শী নেতৃত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

২. যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণ ও স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে পারা।

৩. ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগের ঘটনা সম্ভব হয়েছিল কেবল মুজিবের বিশাল নেতৃত্বের কারণে। শেখ মুজিব স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় দিল্লীতে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের সময় জানতে চান। এতে ইন্দিরা গান্ধী কিছুটা অপ্রস্তুত হলেও সময়মত প্রত্যাহার করা হবে বলে আশ্বস্ত করতে বাধ্য হন।

৪. বিভিন্ন মুসলিম দেশের সঙ্গে কুশলী সম্পর্ক স্থাপন এবং পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের সূচনা তিনিই করেছিলেন।

৫. যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনঃগঠন, সংবিধান প্রণয়নসহ বিভিন্ন আশু করণীয় সম্পাদন।

মুজিব শাসনের ব্যর্থতা

১. দলের নেতা-কর্মী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অনুগ্রহ প্রার্থীদের দুর্নীতি ও সমাজ বিরোধী কার্যক্রম তাঁর নেতৃত্ব ও দল সম্পর্কে জনগণের মোহ কেটে দেয়।
২. দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও উপদল সৃষ্টি করা থেকে তিনি তার অনুসারীদের বিরত রাখতে পারেননি। তাঁর সংগঠন থেকে যুব সমাজের প্রধান অংশ বেরিয়ে গিয়ে জাসদ গঠন করে।
৩. ব্যাপক জাতীয়করণের ফলে প্রতিষ্ঠানে লোকশান, দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি তীব্রভাবে দানা বেঁধে উঠে।
৪. ভারতমুখী নীতি বাংলাদেশের মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করেনি।
৫. ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কৌশল এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভালভাবে গ্রহণ করেনি।
৬. জাতীয় রক্ষী বাহিনীর নির্মম কার্যকলাপ জনমনে ভীতি সঞ্চার করে। অন্যদিকে রক্ষী বাহিনীকে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা প্রদান দেশের প্রতিষ্ঠিত সশস্ত্র বাহিনীকে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে।
৭. দেশব্যাপী সীমাহীন অরাজকতা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা মুজিব নেতৃত্বকে আস্থাহীন করে তোলে।
৮. একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রপতির একচ্ছত্র শাসন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধকরণে মুজিবের নেতৃত্বের ঐতিহ্যকে দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ করে।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ।
২. জাতীয় রাজনীতি, অলি আহাদ।
৩. বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ, আশফাক হোসেন।
৪. বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, আশরাফ কায়সার, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৫. মুসলিম মধ্যবিত্তের রাজনীতি, বদিউজ্জামান।
৬. বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন, প্রভাষক মোঃ ইব্রাহিম মিয়া।
৭. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ উদ্দীন আহমেদ।
৮. বাঙালির ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ হাননান।
৯. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আবুল মনসুর আহমদ।
১০. স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ, সম্পাদনা : ড. মাহফুজ পারভেজ।
১১. বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসী অব ব্লাড, এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস।

লেখক

কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৭৫-২০১৫)

মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

স্বাধীন বাংলাদেশ

এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, তা কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে, স্বাধীনতার ৪৫ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তা সচেতন মহলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। এককথায় স্বাধীনতার পর থেকে যারাই ক্ষমতায় এসেছে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা সফলতা অর্জন করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তারা নিজেরা স্বাধীনতার সুফল পেলেও জনগণ অনেকাংশেই বঞ্চিত।

এত দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরও সন্তোষ মুক্ত শিক্ষাজন গড়ে উঠেনি। সীমান্ত হত্যা বন্ধ হয়নি; বরং এগুলো দিন দিন বাড়ছে। মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের পরিচিতি এখন দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্র হিসেবে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনো দরিদ্র সীমার নিচে বাস করছে। খুন-ধর্ষণ নিত্যদিনের সাথী। যিনি দেশের স্বাধীনতা স্থপতি হিসেবে পরিচিত তাকে স্ব-পরিবারে হত্যা করা হয়েছে। যারা বাংলাদেশকে শাসন করেছেন কেউ ৯২ ভাগ মুসলমানদের দাবি-দাওয়াকে তোয়াক্কা করেনি। অপরদিকে ইসলাম এদেশে অনৈক্যের বেড়াজালে বন্দী। বর্তমান বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই। এখন দেশে এক দলীয় শাসনব্যবস্থা চলছে। ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন স্বৈরশাসন চলছে। বিরোধী দল নিজস্ব দুর্বলতা এবং সরকারের প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থার কারণে আন্দোলনও সফল হচ্ছে না। আগামীর পথ নির্ধারণের নিমিত্তে অতীতকে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে ১৯৭৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সামান্য পর্যালোচনা করা হলো।

মুজিব শাসনের ব্যর্থতা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার মাধ্যমে মুজিব শাসনের অবসান ঘটে। তাই ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক

ইতিহাস লিখতে গেলে মুজিব শাসনের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরতে হয়। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-

১. সেনাবাহিনীর প্রতি উদাসীনতা : যাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, সেই সেনাবাহিনীর প্রতি শেখ মুজিব উদাসীনতা প্রদর্শন করেন।

২. ভারত-রুশ ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি : জোটনিরপেক্ষতার নামে ভারত ও রুশ ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণই তার পতন ত্বরান্বিত করে।

৩. অস্ত্র উদ্ধারে ব্যর্থতা : স্বাধীনতা যুদ্ধের অস্ত্র উদ্ধারের ব্যর্থতাও বঙ্গবন্ধুর পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৪. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন : সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কায়েমের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জনগণের স্বপ্ন ভুলুষ্ঠিত হলে জনগণ মুজিব সরকারের প্রতি বিমূখ হতে থাকে।

৫. বাকশাল গঠন : সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘোষণা করে ‘বাকশাল’ (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) গঠনের ঘোষণা দিলে চারদিকে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

৬. ইসলামের প্রতি উদাসীনতা : সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ধর্ম ইসলাম ও মাদরাসা শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ধর্মপ্রাণ মানুষ মেনে নিতে পারেনি।

৭. গণতন্ত্রের কবর রচনা : আওয়ামী লীগ সরকার দেশে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলে কুঠাখাত করে।

৮. জাতি সত্তার অবমূল্যায়ন : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মুজিব সরকারের পতনের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রগুলোয় এ সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী অনেক প্রতিবেদন ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলো ঢাকার কাগজগুলোয়, বিশেষত দৈনিক ইত্তেফাকে নিয়মিতভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়। এ সব বিদেশী পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয় যে, জাতির আত্মপরিচয় বা জাতিসত্তা সংক্রান্ত বোধ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মূল্যায়নের ব্যর্থতা এবং বিশেষভাবে ইসলামের অমর্যাদা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করা শেখ মুজিবের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। মুজিব সরকারের পতনের মূল কারণ হিসেবে যা পাওয়া যায় তা হলো ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারির বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী। এ কারণে চতুর্থ সংশোধনীর আলোচনা করলে মুজিব সরকারের ব্যর্থতা ও পতনের কারণ ফুটে উঠবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী

১. দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান : অর্থাৎ এ সংবিধান সহজে পরিবর্তনযোগ্য নয়।

২. রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন : সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী মন্ত্রীपरিসদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৩. প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : এ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়।

৪. **আজ্ঞাবহ মন্ত্রিপরিষদ :** এ সংশোধনীর মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদকে রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ করা হয়। রাষ্ট্রপতি যেকোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারবেন বলে উল্লেখ করা হয়।
৫. **উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি :** এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করার জন্য উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়।
৬. **এক দলীয় ব্যবস্থা :** রাষ্ট্রপতিকে একজাতীয় দল গঠনের ক্ষমতা দিয়ে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কার্যকর করার জন্য একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার অনুমতি দেয়া হয়।
৭. **জাতীয় সংসদের মেয়াদ বৃদ্ধি :** এ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের মেয়াদ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বাড়িয়ে দেয়া হয়।
৮. **রাষ্ট্রপতির অপসারণ :** শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা বা সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের স্থলে তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি গ্রহণের বিধান এ সংশোধনীতে করা হয়।
৯. **নিয়ন্ত্রিত নাগরিক অধিকার :** প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার বিদ্যমান ১৯টি জেলাকে ৬১ জেলায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
১০. **সরকারী চাকরিজীবীদের রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার সুযোগ :** সরকারী চাকরিজীবীদেরকে দলের সদস্য হওয়ার সুযোগদান চতুর্থ সংশোধনীর অন্যতম কৌতুহলোদ্দীপক দিক।

চতুর্থ সংশোধনীর প্রেক্ষাপট

১. **অভ্যন্তরীণ চাপ :** ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম এ সম্পর্কে বলেন, “স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অভ্যন্তরীণ চাপের কারণেই সংসদীয় শাসনের প্রতি আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থন চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়।”
 ২. **মতভেদ ও কোন্দলের উদ্ভব :** শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ মনির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের ফলে আওয়ামী লীগের মধ্যে মতভেদ ও কোন্দল সৃষ্টি হয়। ফলে শেখ মুজিব সংসদীয় গণতন্ত্র অপেক্ষা রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করাই উপযুক্ত বলে মনে করেন।
 ৩. **জাতীয় দল গঠনের পরিকল্পনা :** জাতীয় দল গঠনের পরিকল্পনাই শেখ মুজিবকে চতুর্থ সংশোধনী আনতে উদ্বুদ্ধ করে।
 ৪. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত :** শেখ মুজিব রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।
 ৫. **সোভিয়েতপন্থি আওয়ামী লীগ সদস্যদের আকাঙ্ক্ষা :** আওয়ামী লীগের সোভিয়েতপন্থি সদস্যরা সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে একদলীয় শাসন প্রবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করেন।
 ৬. **বিপর্যস্ত অর্থনীতি :** অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য একটি শাসনতান্ত্রিক প্রবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়ে।
- শেখ মুজিব শাসনামলের সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ**
শেখ মুজিবের শাসনামলের পর্যবেক্ষণে দ্বিধা সৃষ্টিকারী ভিন্নমুখী বহু উপাদান পাওয়া

যায়। যা থেকে এ শাসনামল বিষয়ে প্রায়ই বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণ ঘটতে পারে। স্বাধীন বাংলাদেশে পা রেখে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব বলেছিলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। তিনিই আবার দেশটির সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণের ব্যবস্থা করছেন। বেতার টেলিভিশনে কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্য প্রকাশক শব্দ বা বৈশিষ্ট্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করছেন। ইসলামিক একাডেমিসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করছেন। তিনিই আবার ইসলামিক একাডেমি ও বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদরাসা খুলে দেয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা, মাদরাসা বোর্ড স্থাপন করা, ওআইসি-র সদস্যপদ গ্রহণ করা প্রভৃতি কাজে অনেক ঘনিষ্ঠজনকে মনঃক্ষুণ্ণ করেও নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। যদিও এ সময় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অব্যাহত ছিলো। ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির বিদ্যমানতায় ‘ধর্ম সাপেক্ষ’ কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠান বাহ্যত সাংঘর্ষিক আচরণ। শেখ মুজিবের শাসনামলে বাস্তবে তা-ই ঘটেছে। এ সময়ে ‘ধর্ম সাপেক্ষ’ কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার দল আওয়ামী লীগের কিছু শীর্ষ আলেম নেতার দ্বারা যেমন প্রভাবিত ও অনুরুদ্ধ হয়েছেন, তেমনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পরামর্শ, অনুরোধ ও হুমকির দ্বারা উদ্ভুদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছেন বলে দাবি করা হয়। আওয়ামী লীগের দলীয় শীর্ষ আলেম নেতাদের মধ্যে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশের নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

শাসক হিসেবে শেখ মুজিবের অস্থিরচিন্তা এবং পরিনামে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকটই অনাস্থাভাজন হবার বিষয়টিও কোন কোন গবেষক চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। গবেষক মাসুদুল হক লিখেছেন, “শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও শেখ মুজিবের দ্বৈত মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে- যা তাকে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কাছে বিরাগভাজন করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতার কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না বলেই ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরাগান্ধী বাংলাদেশ সফরে এলে শেখ মুজিব যে পঁচিশ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সহযোগিতা চুক্তি সাক্ষর করেন- যা ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাক্ষরিত ভারত-সোভিয়েত চুক্তিরই অনুরূপ, খুশি করে ভারতকে যেমন, রাশিয়াকেও তেমনি। কিন্তু এ চুক্তি শেখ মুজিবের স্ববিরোধী চরিত্রকে তুলে ধরে পশ্চিমা জগত, বিশেষ করে মার্কিন প্রশাসনের কাছে। আবার মার্কিনীদের খুশি করার জন্য এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (পরে প্রধানমন্ত্রী) জুলফিকার আলী ভুট্টোকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনের লক্ষ্যে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন ভারতের। এমনকি তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের কাছে নিজেকে অধিকতর পশ্চিমা ঘেঁষা বলে তুলে ধরার জন্য তাকে (তাজউদ্দীন আহমদকে) অবমাননার চূড়ান্ত করলেন। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে উপ-মহাদেশ সফরে বেরিয়ে বাংলাদেশ আসেন হেনরী কিসিঞ্জার। তার সম্মানে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক ভোজসভার আয়োজন করে। তাজউদ্দীন আহমদকে ঐ ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানানো হলো না এই কারণে

যে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ- তিনি অতিমাত্রায় ভারত ঘেঁষা। একই অভিযোগের কারণে মার্কিন চাপে মন্ত্রিসভা থেকে তিনি হন অপসারিত।

শেখ মুজিবের এই দ্বৈত মানসিকতা অর্থাৎ সব পক্ষকে খুশি রেখে চলার কৌশল, এতে রাশিয়াও বিরক্ত হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবের এই স্ব-বিরোধী চরিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার সম্পর্কে কতটা আস্থাহীন করে তোলে, তা আমরা জানতে পাবো র'র পর্যবেক্ষণ থেকে। র'র সে পর্যবেক্ষণ কি ছিল? শেখ মুজিবুর রহমান দুই পরাশক্তির আস্থা হারিয়েছেন (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ও ভারতেরও। তারা তাদের নিজস্ব লোক না পাওয়া পর্যন্ত তাকে ক্ষমতায় রাখছে। তার অস্থির নীতি তাকে বিশেষ কোন শক্তির প্রতি অনুগত না করায় তাকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করছে। শেখ মুজিব র-এর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। শেখ মুজিবের এই স্ববিরোধী রাজনৈতিক চরিত্রের কারণেই 'সিআইএ' তার পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে আরম্ভ করে।

শেখ মুজিব যা করেছেন যে কারণে করেছেন

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি মাত্র কয়েক মিনিটের সংসদীয় ক্যু এর মাধ্যমে চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে সংবিধানের খোল-নলচে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেলা হয়। জনগণের প্রতিনিধিত্ব, মৌলিক অধিকার, মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা, আইন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা- সব কিছুই ব্যাপারে সকল রীতি-রেওয়াজ, পদ্ধতি ও আইনের আমূল পরিবর্তন করে মধ্য যুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আদলে 'এক দলের' নামে এই দেশের সব কিছু 'এক ব্যক্তির' ইচ্ছার কাছে বিসর্জন দেয়া হয়। আর এ পরিবর্তনের নাম দেয়া হয় 'দ্বিতীয় বিপ্লব'।

যে মানসিকতা থেকে এ অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে এই তথ্য কথিত বিপ্লবের অনেকদিন আগেই লিখেছেন : “সত্যই শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে এই দুর্বলতা ছিলো যে, তিনি যেটাকে পার্টিপ্রীতি মনে করিতেন, সেটা ছিলো আসলে তার 'ইগইজম'-আত্মপ্রীতি। স্ব-রাজদেশের জন্য খুবই দরকার। কিন্তু সেটা যদি আমার হাত দিয়া না আসে তবে না আসাই ভালো। আমার বিবেচনায় মুজিবুর রহমানের মধ্যে আত্মপ্রীতি ছিলো খুবই প্রবল। এটাকে তিনি পার্টিপ্রীতি বলিয়া চালাইতেন। শেখ মুজিবের এই 'ইগইজম'কে কাজে লাগিয়ে নিজেদের মতলব হাসিলের জন্য মসকো পন্থি কম্যুনিষ্টরাই চতুর্থ সংশোধনী নেপথ্য-নায়কের ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ তখন একটা 'তলাবিহীন বুড়ি'। দেশে অর্থভাণ্ডার শূন্য। দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। বিশ্বখ্যাত পত্রিকাগুলো কালোবাজারীকে 'বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি' রূপে চিহ্নিত করছে। মহানগরী পরিণত হয়েছে বে-ওয়ারিশ লাশের নগরীতে। মানুষ কলাপাতায় লজ্জা ঢাকছে। ডাস্টবিনে চলছে মানুষ-কুকুরে কাড়াকাড়ি। গুম, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি সংবাদপত্রের খবর হওয়ার যোগ্যতা হারাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে চলছে অস্ত্রের বান-বনানি। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষের বিশীর্ণ মিছিলের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। সর্বস্তরের মানুষ চাইছে পরিবর্তন। ভুখা জনতার অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠ উর্ধ্বপানে শীর্ণ দু'খানি হাত তুলে ফরিয়াদ করছে, “খোদা গজব থেকে বাঁচাও।” এমনি পরিস্থিতিতে রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনীর ধারালো দাঁত-নখও ভোঁতা প্রমাণিত

হচ্ছিল। এই পটভূমিতে ক্ষমতার মসনদে আসন্ন গণরোষের হাত থেকে হেফাজত করার “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” রূপেই আনা হয় “চতুর্থ সংশোধনী”। দুনিয়ার রাজনীতির ইতিহাসে এ ধরনের সংশোধনীর নথীর নেই।

শেখ মুজিব তাঁর ক্ষমতার বিস্তার ও স্থিতির জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। তার এই ‘ইগয়িস্ট’ মানসিকতাকে সহজেই কাজে লাগাতে পেরেছে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের এদেশী এজেন্টরা। মধ্যপন্থি জাতীয়তাবাদি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ছিলো আন্তর্জাতিকতাবাদি কম্যুনিজমের বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি। এই নীতির উপর ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ একবার ভাগ হয়েছিলো। কিন্তু ৭৩ সালে দেশে বিরাজিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুজাফফর ন্যাপ মনিসিংহ’র কম্যুনিষ্ট পার্টি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা তাদের এজেন্টদের সহযোগিতায় ‘গণঐক্যজোট’ নামে তুদলীয় ঐক্যজোট গঠনে সক্ষম হয়। তাদেরই প্ররোচনায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের এমন এক পর্যায়ে প্রবেশ করে, যেখান থেকে ফিরে আসার সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়।”

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৮২ এর ২৪ মার্চ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সশস্ত্র বাহিনীর এক ক্ষুদ্র অংশের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্ব-পরিবারে নিহত হলে বাংলাদেশে শেখ মুজিব শাসনামলের অবসান ঘটে। কর্নেল ফারুক ও রশীদের নেতৃত্বের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় সেনা প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ এবং উপ-সেনাপ্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। শেখ মুজিবের পর তার দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক সহকর্মী খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পান অথবা গ্রহণ করেন। আগস্টের শেষ সপ্তাহে জেনারেল শফিউল্লাহ-র স্থলে সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন জেনারেল জিয়াউর রহমান। অভ্যুত্থানের শেষে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক দেশে সামরিক আইন জারি করেন, যার ফলে কিছু নাগরিক-রাজনৈতিক অধিকার স্থগিত করা হয়। তবে তিনি জাতীয় সংসদ বাতিল করেননি এবং দেশে সামরিক শাসনের প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেননি। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর একটি পাল্টা সশস্ত্র অভ্যুত্থানে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (সেনা বাহিনীর তৎকালীন চিফ অব জেনারেল স্টাফ-সিজিএস) ও তার স্বল্প সংখ্যক অনুগামী বঙ্গভবনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের নেতাদের প্রবাসে পাঠান এবং সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে গৃহ অন্তরীণ করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ নিজেকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করেন। খন্দকার মোশতাকের স্থলে খালেদ মোশাররফ ও তার শুভাধীরা তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েমকে ১৯৭৫-এর ৬ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত করিয়ে বঙ্গভবনে অধিষ্ঠিত করেন। ৬ নভেম্বর দিবাগত মধ্যরাত থেকে সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান শুরু হয়। এতে অংশ নেন কর্নেল (অব.) আবু তাহের গঠিত ‘বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার’ সাথে সংশ্লিষ্ট সৈনিকরা, জাসদ-সৃষ্ট ‘বিপ্লবী গণবাহিনী’র সমাজতন্ত্রপন্থী বেসামরিক ব্যক্তিরা এবং ভারত বিরোধী মানসিকতা সম্পন্ন ও জেনারেল জিয়ার প্রতি অনুরাগী সৈনিকেরা উল্লেখিত চার ধারা ‘সিপাহী ও জনতা’ যেভাবেই হোক প্রায় একই রকম ভূমিকায় একই সময় অবতীর্ণ হন। ‘বিপ্লবী’ (সমাজতন্ত্রী?) সৈনিকদের মিছিলে বিভিন্ন শ্লোগানের দুটি ছিলো এমন : ক. “সিপাই সিপাই ভাই ভাই-সুবেদারের উপর অফিসার নাই” ও খ.

“সিপাই সিপাই ভাই ভাই-অফিসারদের রক্ত চাই।” ‘অফিসারদের রক্ত চাইবার’ ভয়ঙ্কর পরিণতিতে এ অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর একজন লেডী মেডিকেল অফিসার ডা. চেরীসহ ১২ জন আর্মি অফিসার নিহত হন। এ অভ্যুত্থানের (বিপ্লবের?) নায়ক সিপাহীরা ৬ নভেম্বর মধ্য রাতের কিছু পরেই গৃহবন্দী অবস্থা থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করেন এবং জিয়ার হাতে তাদের নেতৃত্ব অর্পণ করেন। ৭ নভেম্বর সকালে ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের নায়ক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ‘বিপ্লবী সৈনিকদের’ হাতে নিহত হন। ৬ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব গ্রহণকারী বিচারপতি সায়েম ৭ নভেম্বর এক ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম জাতীয় সংসদ বাতিল করেন, সামরিক শাসনের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করে নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক- সিএমএলএ ঘোষণা করেন। ৬ নভেম্বর রাতব্যাপী ও ৭ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ‘সিপাহী-জনতার বিপ্লবের’ প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ বিচারপতি সায়েম জেনারেল জিয়াকে ৭ নভেম্বর সেনাপ্রধান হিসেবে ‘অন্যতম ডিসিএমএলএ’ (উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক) নিয়োগ করেন। এভাবেই জেনারেল জিয়া বাংলাদেশের ‘ক্ষমতা-কেন্দ্রের’ নিকটবর্তী অবস্থান ‘লাভ’ করেন। অতপর সময়ের ব্যবধানে তিনি সিএমএলএ (২৯ নভেম্বর ১৯৭৬) ও প্রেসিডেন্ট (১১ এপ্রিল ১৯৭৭, সামরিক এবং অতপর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত)- এর দায়িত্ব ‘গ্রহণ’ করেন।

১৯৮১-র ৩০ মে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হন। তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট এর অস্থায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৫ নভেম্বর ১৯৮১)। চার মাসের ব্যবধানে তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জে. এইচ. এম এরশাদ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশে সামরিক শাসন জারি করে বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং এই সাথে জিয়াউর রহমান শাসনামলের অবসান ঘটে। বর্তমান গবেষণাকর্মে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৮২ পর্যন্ত সময়কালকে ‘জিয়াউর রহমান শাসনামল’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

জিয়াউর রহমান যেভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন

১. সামরিক বাহিনীর প্রধান : সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়ার কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ক্ষমতা ছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানের হাতে। আর সামরিক বাহিনী তারই নেতৃত্বে পরিচালিত হতো।

২. সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ : ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ নিহত হলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে পুনরায় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

৪. সামরিক আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা : ১৯৭৬ সালের মার্চ মাস থেকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তাওয়াব, নৌবাহিনী প্রধান রিয়াল এডমিরাল মোশাররফ হোসেন সভা-সমিতি, সেমিনার ও আলোচনার আয়োজন করে সামরিক আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা দিতে থাকে।

৫. তাওয়াবের অপসারণ ও কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ড : ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের

রাজনৈতিক অঙ্গনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। যার একটি হলো জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তাওয়াবকে বলপূর্বক ক্ষমতা থেকে অপসারণ এবং অপরটি হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান।

৬. নির্বাচন অনুষ্ঠান ও দলীয় কার্যক্রম : তারপর ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে পুনরায় দলীয় কর্মকাণ্ড শুরু হবে এবং ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন।

৭. মোহাম্মদ সায়েমের পদত্যাগ ও জিয়াউর রহমানের দায়িত্ব গ্রহণ : ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল বিচারপতি আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

জিয়াউর রহমানের আমলে পঞ্চম সংশোধনী

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮৯ সালের ৫ এপ্রিল সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আনয়ন করেন। এ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এবং ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিলসহ মধ্যবর্তী সময়ে যে সব আইন, নির্দেশ, ঘোষণা, সামরিক আইনবিধি, অধ্যাদেশ সম্পন্ন হয়েছিলো, তার সবকিছুই বৈধতা দান করা হয়।

পঞ্চম সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সংবিধানের প্রস্তাবনার পরিবর্তন : প্রস্তাবনায় দু'টি পরিবর্তন আনা হয়। ক) প্রস্তাবনার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' অর্থাৎ পরম করুণাময় অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এ কথাগুলো সংযোজন করা হয়। খ) সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'মুক্তি সংগ্রাম' শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশিত হয়।

২. রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন : ক) বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পরিবর্তন করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। খ) ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আস্থা ও বিশ্বাস কথাগুলো সংযোজন করা হয়। গ) সমাজতন্ত্র নামক অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার এ অর্থে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৩. আইনের দ্বারা নাগরিকত্ব নির্ধারণ : ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বরের ঘোষণা মুতাবেক সংশোধনী আনয়ন করা হয় যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং বাংলাদেশের নাগরিকরা বাংলাদেশী বলে গণ্য হবে।

জিয়ার শাসনামলে ইসলামী দল

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব থেকে এ অঞ্চলে উলামা নেতৃত্বের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (মাহমুদ হাজারভী) সক্রিয় ছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাংবিধানিক মূলনীতি ও বিধানের আওতায় ধর্ম সংশ্লিষ্ট ও ধর্মভিত্তিক সকল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী নিষিদ্ধ হওয়ায় উলামা নেতৃত্বের দলগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই সরকার রাজনৈতিক দলবিধি (পলিটিকেল পারটিজ রেগুলেশন্স পিপি আর) ঘোষণা করার পর ১৯৭৬

সালের ২৪ আগস্ট ঢাকায় এডভোকেট আবদুল জলীলের বিকাতলাহু বাসভবনে নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি, ইমারত পার্টি এর সমন্বয়ে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডি এল) প্রতিষ্ঠিত হয়। নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা খতীবে আজম সিদ্দীক রহ. কে আইডি এল এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭৭ সালের ২৩ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর চক্রান্তে আইডি এল ভেঙ্গে যায়।

জিয়াউর রহমানের আমলে নির্বাচন

১. ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তার অনুসৃত নীতি, কর্মপন্থা এবং তার প্রতি দেশবাসীর আস্থা যাচাইয়ের জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।
২. ১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন এবং ৬টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদি ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেন। তার বিপরীতে ছিল আওয়ামী লীগসহ ৫টি সেকুলার ও বামপন্থি রাজনৈতিক দলের সমন্বয় গঠিত জোট ‘গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট’। এ জোটের প্রার্থী ছিলেন এমএজি ওসমানী।
৩. ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ধর্মবিরোধী কাজ

১. ১৯৭৭ সালের শুরুতে ঢাকা জিপিও-র দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের গোলচত্তরে একটি মানুষ্যমূর্তির ভাস্কর্য নির্মিত হয়। পরে উলামায়ে কেরামের আন্দোলনে সরকার তা অপসারণ করতে বাধ্য হয়।
২. অতপর দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংখ্যক ‘প্রাণি মূর্তির’ ভাস্কর্য নির্মিত হয়।
৩. প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে শিখা অনিবাণ বাংলাদেশে অগ্নিপূজার প্রথম উদ্বোধন করা হয়।

জিয়াউর রহমানের সঙ্গে হাফেজী হুজুর রহ.

মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজী হুজুর রহ. রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে যখন আন্দোলনের কর্মসূচি হাতে নেন তখন প্রথমে তিনি তৎকালীন শাসকদের ভ্রান্তপথ পরিহার করে এই মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী হুকুমত কায়েমের আহ্বান জানান। ১৯৭৮ সালের ২৫ মে ১০ সদস্যের একটি উলামা প্রতিনিধি দল নিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে তিন ঘণ্টা তার সাথে আলাপ করেন এবং ইসলামী হুকুমত কায়েমের আহ্বান জানান। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এ বৃদ্ধ অলির নসীহতে কর্ণপাত কনেনি। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্ট নৈরাজ্য এবং শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের এক পটভূমিতে প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৮০ সালে নিহত হন।

এরশাদের শাসনামল

১৯৮২-র ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনা প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এক সামরিক অভ্যুত্থানে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ বিরোধী দলসমূহের মনোনীত

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

ধর্মীয় কাজে এরশাদ

১. সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা, ২. শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা, ৩. রেড ক্রস সোসাইটিকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে রূপান্তর।

১৯৮১ সালে ইসলামী দল

আরেফ বিল্লাহ হাফেজী হুজুর রহ. ১৯৮১ সালের ১৯ আগস্ট ঢাকায় শীর্ষস্থানীয় উলামা-মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবীদের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনে দেশের শীর্ষস্থানীয়, গণ্যমান্য এবং অনুসরণীয় প্রায় সকল উলামা-মাশায়েখগণই উপস্থিত হয়ে দেশের বিরাজমান সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। এ সম্মেলনে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ওলামাদের পক্ষ থেকে একজন একক প্রার্থী দানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। ঐতিহাসিক সম্মেলনে হযরত হাফেজী হুজুরকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

অতপর ৮১-র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। সরকারী ছত্র-ছায়ার ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হযরত হাফেজী হুজুর রহ. ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭ শ ৪১ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেন। নির্বাচনের পর ২৯ নভেম্বর ১৯৮১ ঢাকায় আহুত কর্মী সম্মেলনের পূর্বে দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামা-মাশায়েখ ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে তিনদিন ব্যাপী স্থায়ী এক বৈঠকে হাফেজী হুজুর মিলিত হয়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর বিগত নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্ট দেশের ইসলামী গণজাগরণকে আরো সক্রিয় ও সাংগঠনিক রূপ দানের উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী রাজনৈতিক প্লাট ফরম গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সম্মেলনের এই সুপারিশক্রমে ২৯ নভেম্বর ১৯৮১ লালবাগ শায়েস্তা খান হলে অনুষ্ঠিত প্রায় দশ হাজার কর্মী ও দেশ-বিদেশের অর্ধশতাধিক সাংবাদিকের জনাকীর্ণ এক সম্মেলনে হাফেজী হুজুর তার সিদ্ধান্তকৃত প্লাটফর্ম ‘বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন’ এর নাম ঘোষণা করেন। এ সম্মেলনেই হাফেজী হুজুর রহ. কে সংগঠনের প্রধান আমীরে শরীয়ত নামে অবিহিত করা হয়।

হুজুরের জীবদ্দশায় এ আন্দোলনের প্রধান নায়েবে আমীর ছিলেন তার প্রাণপ্রিয় শাগরেদ ও খলীফা যুগের অবিসংবাদিত নেতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই রহ.।

১৯৮৬ সালে খেলাফত আন্দোলনের ভাঙ্গন

১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ বিষয়ক ভিন্নমতের প্রেক্ষাপটে হাফেজী হুজুর রহ. এর দল খেলাফত আন্দোলন থেকে তার দীর্ঘ দিনের সহচর ও সহকর্মী শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক ও মাওলানা আবদুল গাফফারের নেতৃত্বে নেতাকর্মীদের একটি অংশ খেলাফত আন্দোলনে পৃথকভাবে কার্যক্রম চালাতে থাকেন।

বাংলাদেশের ইক্কানি উলামায়ে কেরাম ১৯৮৬ সালের খেলাফত আন্দোলন ভাঙ্গার পেছনে যুবশিবিরের নেতা অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের বাচ্চুকে দায়ী করেন এবং জামায়াতি চক্রান্তের অংশ মনে করেন।

১৯৮৯ সালে খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠা

১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক সাহেবের নেতৃত্বে যুবশিবিরের সাথে যুক্ত হয়ে খেলাফত মজলিস নামে একটি নতুন দল গঠিত হয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

সামরিক হস্তক্ষেপ যেহেতু সংবিধান পরিপন্থি সেহেতু সামরিক শাসকগণ ক্ষমতা দখলের পর তাদের শাসন প্রক্রিয়াকে বৈধ করার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া বলে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ এক সামরিক ঘোষণা দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বিক ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন এবং দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করেন। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বোতার ভাষণে বলেন যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই তার প্রধান লক্ষ্য।

তার বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

১. ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা : ১৯৮৩ সালের ১৭ মার্চ তার সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি মনে করেন, এ ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলে দেশের সমস্যাবলির সূষ্ঠা সমাধান এবং জনসাধারণের ভাগ্য উন্নত হবে।

২. ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান : ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে তিনি ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি এবং ১৯৮৪ সালের ১লা এপ্রিল প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান করেন।

৩. ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন : ১৯৮৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ জারি করেন এবং এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে ৪৩৫২ টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ঐ সময় ৭৬টি পৌরসভা ও ৩টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৪. গণভোট অনুষ্ঠান : ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ তার সরকারের প্রতি জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গণভোট অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

৫. উপজেলা নির্বাচন : তার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি হিসেবে ১৯৮২ সালে থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক পুনঃবিন্যাসের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে থানাগুলোকে উপজেলায় পরিণত করা হয়। ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৬. রাজনৈতিক দল গঠন : প্রথমে তারই প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে ‘জনদল’ নামে একটি নতুন দল গঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি ‘জনদল’ বিলুপ্ত করে ‘জাতীয় পার্টি’ নামে একটি নতুন দল গঠিত হয়।

৭. সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ : ১৯৮৪ সালের ২৭ মে নির্বাচনের তারিখ ধার্য করে। কিন্তু বিরোধী দলগুলোর বাধায় এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পরে ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছিল। একই কারণে সেটাও অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। অতপর ১৯৮৫ সালের ৬ এপ্রিল নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়েছিলো, সেটিও অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

৮. জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৯. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১০. সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী : নির্বাচিত জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে

সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে গৃহীত হয়।

১১. সামরিক আইন প্রত্যাহার : তিনি ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন।

১২. নতুন মন্ত্রিসভা গঠন : তিনি স্থগিত সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা পুনরুজ্জীবিত করে ২৬ সদস্যের এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

১৩. জাতীয় সংসদের অধিবেশন : তৃতীয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ১০ জুলাই।

১৯৮৭ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

১৯৮৭ সালের ৩ মার্চ ঢাকার মতিঝিলস্থ ‘শরীফস ইনে’ অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে ‘ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন’ আত্মপ্রকাশ করে। অতপর ১৩ মার্চ ১৯৮৭ প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই, হযরতুল আল্লাম শাইখুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক সাহেব, হযরত মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব প্রমুখের নেতৃত্বে বাইতুল মুকাররম জনসমক্ষে আন্দালনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আন্দালনের আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এ গণসমাবেশ তৎকালীন এরশাদ সরকারের পুলিশ বাহিনীর আক্রমণে আন্দোলনের বহু নেতাকর্মী রক্তাক্ত ও আহত হয় এবং অনেকেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। এ আন্দোলনের বিপ্লবী কাফেলা বহু ঘাত-প্রতিঘাত চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ আন্দোলনের আমীর হচ্ছেন এদেশে লক্ষ লক্ষ ইসলামপ্রিয় মানুষের প্রাণপ্রিয় আধ্যাত্মিক রাহবার ও ধর্মীয় নেতা কামেল বুয়ুর্গ হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই। ইতোপূর্বে তিনি বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের প্রধান নায়েবে আমীর ছিলেন।

এরশাদের ব্যর্থতা

১. বিভিন্ন নির্বাচনে কারচুপি ও সন্ত্রাস : জেনারেল এরশাদ ক্ষমতাকে বৈধ করার লক্ষ্যে গণভোট, সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও স্থানীয় পর্যায়ে একাধিক নির্বাচন সম্পন্ন করলেও ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির কারণে এ সব নির্বাচন দেশ বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা হারায়। ফলে তিনি বৈধতার সংকট কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হন।

২. নূর হোসেনের হত্যা : জরুরি অবস্থা অমান্য করে তরণ যুবক নূর হোসেন “স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক” এ শ্লোগান পিঠে লিখে রাজ পথে বের হলে সেনাবাহিনীর গুলিতে তার বুক ঝাঝরা হয়ে যায়।

৩. ১৯৮৮ সালের বন্যা : ১৯৮৮ সালের বন্যায় বন্যাদুর্গত মানুষের অবস্থা ও ত্রাণ বিতরণে তিনি চরম অবহেলার পরিচয় দেন।

৪. সামরিক বাহিনীর অসহযোগিতা : ক্ষমতা গ্রহণের সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর অংশিদারিত্বের প্রতিশ্রুতি দিলেও ক্ষমতা গ্রহণের পর উক্ত প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পালনে ব্যর্থ হন।

নব্বইয়ের গণআন্দোলনের কারণসমূহ

১. এরশাদ সরকারের স্বৈরাচারিতা : ক্ষমতা দখলের পর এরশাদ এবং তার দল স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে শাসন কার্যক্রম চালানোর ফলে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে তার

শাসনের বিরুদ্ধে এক গণআন্দোলনের সূচনা করে।

২. সেনাবাহিনীর প্রাধান্য : বেসামরিক জনগণের কোন তোয়াক্কা না করে এরশাদ সরকার সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে সামরিকবাহিনীর লোক নিয়োগ করায় বেসামরিক জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

৩. বিরোধী দলের প্রতি অবজ্ঞা : ক্ষমতা ও অর্থের টোপ দিয়ে অনেক নেতা ও কর্মীকে হাত করে রাজনৈতিক দলগুলোকে হেয়-তুচ্ছ করে সেই ফ্যাসীবাদী নীতি-‘এক নেতা এক দেশ’ অনুশীলনের জন্য ‘জাতীয় পার্টি’ গঠন করলে জনগণ তা মেনে নিতে পারে নি।

৪. আমলাদের ভূমিকা : আন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করে দেশের আমলারা জেনারেল এরশাদের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেন।

৫. বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের ভূমিকা : ডাক্তার, ব্যাংক কর্মচারী, উকিল, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক সর্বোপরি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিলে আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে উঠে।

নব্বইয়ের গণআন্দোলনের ফলাফল

১. স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন : এরশাদের স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের জনগণ জেগে উঠে এবং গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। ফলে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে।

২. নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন : এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয় যা গণতন্ত্র চর্চার পথকে সুগম করে।

৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা : এ আন্দোলনের ফলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়।

৪. সামরিক শাসনের অবসান : ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৫ বছরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের অবসান ঘটে।

খালেদা জিয়ার শাসনামল

১৯৯০ এর ৬ ডিসেম্বর হতে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ : ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাব উদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৯৯১-র ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন আয়োজনে তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ন্যায্যতার সাথে সহযোগিতা করেন। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি পর্যাপ্ত উঁচু মাত্রার স্বচ্ছ ও অবাধ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয় এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (জামাত)- এর নিঃশর্ত সমর্থনে দলটি সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ ১৯৯৪ সালের এক পর্যায়ে ‘গণপদত্যাগ’ করার ফলে এবং একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকার প্রেক্ষাপটে সংসদে বিরোধী দলীয় আসনসমূহ শূন্য ঘোষিত হয়। বিরোধী সদস্যবৃন্দ বাস্তবে হেবরণের এক মসজিদে ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলী নৃশংসতার প্রতিবাদে সংসদে মূলতবি আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হওয়ায় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন এবং অতপর অভিযুক্ত মাগুড়া-২ উপনির্বাচনের প্রেক্ষাপটে নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

সাংবিধানিক ব্যবস্থার দাবিতে অব্যাহতভাবে সংসদ অধিবেশন বর্জন করতে থাকেন। অব্যাহতভাবে সংসদ অধিবেশন বর্জনের প্রেক্ষাপটেই বিরোধী দলীয় সদস্যবৃন্দের আসনসমূহ শূন্য ঘোষিত হয়। প্রধানত বিপুল সংখ্যক শূন্য আসনের উপ-নির্বাচন এড়াবার জন্য বেগম খালেদা জিয়া পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর ভেঙ্গে দেন। ১৯৯৬-র ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতসহ প্রধান বিরোধী দলসমূহ অংশগ্রহণে বিরত থাকে এবং সে নির্বাচনে ভোট না দেয়ার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারির তারিখের জন্য গণকারফিউ ঘোষণা করে জনগণকে হুশিয়ার করে দেন, ভোট দিতে গিয়ে কেউ আক্রান্ত হলে আওয়ামী লীগ দায়ী থাকবে না। প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা এবং ভোট দিতে গেলে ‘আক্রান্ত হবার’ শেখ হাসিনার হুশিয়ারীর প্রেক্ষাপটে এ নির্বাচনে গড়ে ১৫% ভোটারের উপস্থিতি ঘটেছিলো বলে পর্যবেক্ষক মহল দাবি করে। তবে নির্বাচনী ফলাফলে ৫০% এর বেশি ভোট প্রদানের কথা বলা হয়। অন্য বড় দলগুলোর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার প্রেক্ষাপটে বিএনপি সহজেই ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়। ১৯ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে ৬ষ্ঠ সংসদের প্রথম ও একমাত্র অধিবেশনটি শুরু হয়, ২৬ মার্চ দিবাগত রাতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী গৃহীত হয়, ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস ‘নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার’ বিলে সম্মতি প্রদান করেন এবং ২৯ মার্চ প্রাধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অনুরোধে প্রেসিডেন্ট ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। পরদিন ৩০ মার্চ ১৯৯৬ বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বেগম খালেদা জিয়া শাসনামলের অবসান ঘটে।

৯১ এর নির্বাচনে বিএনপির বিজয় জামায়েতের সমর্থন ও একটি পর্যালোচনা

৯০ সালের গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের অধিনে ৯১ তে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেনা সদস্যদের হাতে নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি গণমানুষের আস্থা ও ভালবাসার প্রতিফলন হিসেবে ৯১-এর নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এককভাবে সরকার গঠনের যোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। তখন পরিস্থিতিটা ছিল এমন, জামায়াত যদি বিএনপিকে সমর্থন না দেয় তাহলে বিএনপি সরকার গঠন করতে পারবে না অর্থাৎ জামায়াতের হাতে ছিল ক্ষমতার রিমোট। তখন জামায়াত যদি বিএনপিকে সংবিধানের কুরআন বিরোধী ধারা পাল্টানোর জন্য এবং ইসলামী ধারা প্রবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতো তখন বিএনপি বাধ্য হয়ে তা মেনে নিতো। কিন্তু ইসলামী দলের পরিচয় বহন করা জামায়াত তা করেনি; বরং একটি ইসলামী দলের পরিচয় বহন করে বাংলাদেশে সর্ব প্রথম নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করে। আর এভাবে বাংলাদেশে নারী নেতৃত্বের ধারা চালু হয়।

ইসলামী এক্যাজেট গঠন

১৯৯১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে এর আবির্ভাব হয়। এ জোটের শরিক

দলগুলো হলো, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম পার্টি, ফরায়েজী আন্দোলন এবং উলামা কমিটি। এ সাতটি দল নিয়ে গঠিত জোট ১৯৯১ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১টি আসন লাভ করে। এ জোটের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রথম থেকেই শায়খুল হাদীস আব্দুলামা আজীজুল হক সাহেব পালন করে আসছেন। মাঝখানে ১৯৯৪-৯৬ সালে এর চেয়ারম্যান ছিলেন আমীরুল মুজাহিদিন হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই। ৯৬ এর নির্বাচনে এ জোট ১টি আসন লাভ করে। জোট গঠিত হওয়ার কিছুকাল পর বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন জোট থেকে বেরিয়ে যায়।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্মলাভের পর ১৯৭২ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা আরোহণের পর ত্রয়োদশ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে। দীর্ঘ ১৫ বছর রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার নামে দেশে স্বৈরশাসন চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের মাধ্যমে এদেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পুনঃজাগরণ ঘটে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

১. নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন ২. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন ৩. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কঠোরতা ৪. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম ৫. বিদেশী পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা ৬. নির্বাচনে অধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ৭. আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ৮. নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করা ৯. নির্বাচনে কারচুপি রোধ ১০. জবাবদিহিতা ১১. রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিমালা প্রচার ১২. অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার রোধ ১৩. প্রচার ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ ১৪. নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টি ১৫. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন ১৬. স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা ১৭. নির্বাচনী আইনকে কঠোরভাবে মেনে চলা।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে ধর্মদ্রোহীদের উৎপাত

১. ১৯৯১ সালের প্রায় শুরু থেকে গণতন্ত্রের ‘সাড়ম্বর’ যাত্রা যখন শুরু হয় তখন থেকে মুসলিম নামধারী অনেক মুনাফিকের মুখ থেকে মুখোশ খসে পড়ে। ৯১ সালের পুরোটাই ছিলো এই মুনাফিকদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশের বছর।

২. আযানের বিরুদ্ধে কবি শামসুর রাহমান ও কবির চৌধুরী গণদের হামলা বিএনপি আমলের আশকারার ফল।

৩. ১৯৯২ সালের ৪ মার্চ এর খবর, ইডেন গার্লস কলেজের বদরুল্লাহ হলে মসজিদ কক্ষে জনৈক হিন্দু ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা করা হয়। ফলে নামায কক্ষে ছাত্রীদের নামায আদায় বন্ধ হয়। সরকার এব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করলেন।

৪. ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল ২১ জন মুরতাদ একত্রিত হয়ে ঢাকার লালবাগে প্রতিষ্ঠা করে একটি সংগঠন। তাদের সংগঠনের নাম ছিলো ‘মৌলবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন’। এই কুলাঙ্গাররা সরকারের কাছে দাবি জানায়, মসজিদে মুনাজাত

বন্ধের, আর কুরআনের পলিটিক্যাল আয়াত নিষিদ্ধের। দিকে দিকে এর প্রতিবাদ উঠলেও সরকার কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশান নিলেন না।

৫. ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সাল অশীতিপর সুফিয়া কামাল বোরকা পরাকে অপচয় বলেই ক্ষান্ত হননি; এই অপচয় তথা বোরকা পরার বিরুদ্ধে আন্দোলনেরও ডাক দিলেন। সরকার এ ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেন।

৬. ১৯৯৪ সালের ৩ আগস্ট আদালত থেকে জামিন লাভ করার পর ৯ আগস্ট মঙ্গলবার আঁধার-ভোরে সুইডেনের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেন তাসলিমা নাসরিন সরকারেরই সহযোগিতায়। সরকার তাসলিমার বিরুদ্ধে মুখ খোলা তো দূরের কথা; বরং সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিয়ে তাসলিমাকে প্রমিনেন্ট করলেন। তাসলিমা নাসরিনের আবির্ভাব, তার সীমাহীন দৌরাত্ম্য এবং ইসলাম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার বড্ড বাড়াবাড়ি বিএনপির শাসনামলের ‘স্বর্ণ ফসল’।

শেখ হাসিনার শাসনামল

১৯৯৬ এর ২৩ জুন থেকে ২০০১ এর ১ অক্টোবর বিচারপতি মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৬-র ১২ জুন জাতীয় সংসদের সপ্তম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে এবং জাতীয় পার্টির সমর্থনে ২৩ জুন ১৯৯৬ সরকার গঠন করে। শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের চার দলীয় জোট এবং পীর সাহেব চরমোনাহর নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন অব্যাহত আন্দোলন করে। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার পাঁচ বছরের পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকতে সক্ষম হয় এবং মধ্য জুলাই-এ ২০০১ বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদের অষ্টম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে চার দলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

সপ্তম জাতীয় নির্বাচন

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পর নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬ সালের ১২ জুন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সপ্তম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে। দেশের প্রধান দলগুলো ৩০০ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী দলের সংখ্যা ছিলো ৮১টি। মোট প্রার্থী ছিল ২,৫৭৪জন, মোট ভোটদার ছিল ৫,৬৭,১৬,৯৩৫ জন এবং মোট প্রদত্ত ভোট ৪,১৫,০০,০০০টি। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে খুলনা বিভাগে ৮২% এবং সবচেয়ে কমভোট পড়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে ৬০%।

আওয়ামী লীগের জয়লাভের কারণসমূহ

১. ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতার অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত জনসম্মুখে তুলে ধরা : আওয়ামী লীগ তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপির ক্ষমতার অপব্যবহার, নির্বাচনে কারচুপি এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যং করার বিষয়গুলো জনগণের নিকট উন্মোচন করে তাদের আস্থা লাভ করে।

২. অতীত ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা : ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় আওয়ামী

লীগ অতীত ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

৩. গণজোয়ার : সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ‘একবার ক্ষমতায় যেতে দিন’, ‘একটি বার পরীক্ষা করে দেখুন’ প্রভৃতি অভিনব প্রচার কৌশলে দেশে আওয়ামী লীগের অনুকূলে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় সূচিত হয়।

৪. আওয়ামী নেত্রী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ভোট পাওয়ার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করেন। যেমন মাথায় পট্টি বাঁধেন, মাজার জেয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন, বারবার উমরায় গমন ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১. চার দলীয় জোট গঠন ২. সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের সর্বস্তরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ব্যাপক দলীয়করণ আত্মীয়করণ ও পারিবারিকীকরণ ৩. ক্ষমতাসীন দলের ছত্র-ছায়ায় সারাদেশে বেশকিছু সন্ত্রাসী গ্রুপ তৈরি এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যা ৪. চরমপন্থী ইসলামী মৌলবাদীদের দমনের নামে ইসলামী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও নিরিহ মাদরাসা শিক্ষক-ছাত্রদের ধরপাকড় ও হয়রানী, ৫. বেশ কয়টি ব্যাপক বিধ্বংসী বোমা হামলার দায় তদন্তের পূর্বেই রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক উলামার উপর চাপানো।

৬. বিভিন্ন এনজিওর ধর্মবিদ্বেষী কার্যক্রম

ক) সরকারের এনজিও বিষয়ক দপ্তর ‘এনজিও ব্যুরো’ ১০০টি এনজিওর উপর তদন্ত চালিয়ে ৫২টিকেই খিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরের কাজে সরাসরি লিপ্ত হিসেবে দেখতে পায়।

খ) ১৯৯৮ এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলা শহর বি-বাড়িয়ায় নিয়াজ মুহাম্মদ খান স্টেডিয়ামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিকাসহ এয়েকটি এনজিও বিজয় মেলার আয়োজন করে। তাদের প্র্যাকার্ড ও শ্লোগানের ভাষা ছিলো, “ফতোয়াবাদ নিপাত যাক” “জজ-ম্যাজিস্ট্রেট থাকে ঘরে, মোল্লা কেন বিচার করে” ‘হে হে রৈ রৈ মোল্লারা গেলো কৈ’

গ) ১৯৯৮ এর ৭ ডিসেম্বর বি-বাড়িয়ার উলামাগণ বিজয় মেলা ভেঙ্গে দেয়ার জন্য অগ্রসর হয়। পরদিন ৮ ডিসেম্বর উক্ত শহরে হরতাল পালিত হয়। উলামাদের পক্ষে মুফতি আবদুর রহীম কাসেমী প্রশিকা প্রধান ও তার সহযোগীদের বিবাদি করে একটি মামলা দায়ের করেন। তারাও উলামাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

৭. ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের দুই বিচারপতির একটি বেঞ্চ সব ধরনের ফতোয়া নিষিদ্ধ করে।

৮. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ শিক্ষণ : বাংলাদেশের উলামার কল্পিত ‘গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি’ সংশোধনের জন্য দুই বিচারপতির ‘তাৎক্ষণিক সুপারিশ’ হলো, মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ স্কুল এবং মাদরাসা শিক্ষা কারিকুলামে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সমস্ত মসজিদের খতীবদেরকে তাদের শুক্রবারের খুৎবায় অধ্যাদেশটি আলোচনা করার অবশ্যই নির্দেশ দিতে হবে। উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে উক্ত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের উলামা সেই ১৯৬১

সালের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের লৌহ শাসনকে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে তার ঘোষিত আইনটিকে সে সময় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইতোমধ্যে জানা গেছে, খোদ পাকিস্তানেরই পরবর্তী এক সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশটি সে দেশে বাতিল ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশে সেই বাতিল আইনটি শিক্ষার্থী ও দেশবাসীকে কেন শিখাতে হবে?

৯. শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরামকে গ্রেপ্তার : শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনী, মুফতি এজহারুল ইসলাম চৌধুরী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ইমতিয়াজ আলমসহ শত শত উলামায়ে কেরামকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১০. বি-বাড়িয়া ট্রাজেডি ২০০১ : ২০০১ এর ৬ ফেব্রুয়ারি উলামায়ে কেরামকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান করা হলে শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি করে হত্যা করা হয় ৬জন মাদরাসার ছাত্রকে।

১১. আলেম-উলামা ও ইসলাম পন্থীদের গ্রেপ্তার : আওয়ামী সরকার প্রতিটি হত্যাকাণ্ডে; যেমন যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে হত্যাকাণ্ড (৬ মার্চ, ১৯৯৯), কবি শামসুর রহমানকে কথিত হত্যার প্রচেষ্টা (২ জানুয়ারি, ১৯৯৯), কাজী আরেফ হত্যাকাণ্ড (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯), সাংবাদিক শামসুর রহমানের হত্যাকাণ্ড (১৬ জুলাই, ২০০০), সিপিবি-র মহাসমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে হত্যাকাণ্ড (২০ জানুয়ারি, ২০০১), ১লা বৈশাখে রমনার বটমূলে বোমা বিস্ফোরণে হত্যাকাণ্ড (১৪ এপ্রিল, ২০০১), আলেম-উলামাদের জড়িয়ে শত শত আলেম-উলামা ও ইসলাম পন্থীদের গ্রেপ্তার করেছে। এই পর্যন্ত সরকার ৩০ হাজার আলেম-উলামাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেছে। অথচ এ সব ঘটনার কোনটিতেই আলেম-উলামা বা ইসলামপন্থীরা জড়িত প্রমাণিত হয়নি।

১২. পার্বত্য শান্তিচুক্তি : শেখ হাসিনার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে অন্যতম হলো পার্বত্য শান্তিচুক্তি। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্ত লারমার মধ্যে চুক্তিটি সাক্ষরিত হয়। প্রধান বিরোধী দলসহ সব ইসলামী দল পার্বত্য চুক্তিকে কালোচুক্তি আখ্যায়িত করে তা বাতিলের জন্য দাবি জানাতে থাকে। চুক্তিটি পার্বত্য শান্তির জন্য করা হলেও দিনদিন এ অঞ্চলে বেড়েই চলছে অন্তর্ঘাত কর্মকাণ্ড। দৈনিক ইনকিলাব ২ ডিসেম্বর ২০১৫ প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারী সূত্র মতে গত ১৮ বছরে পার্বত্য অঞ্চলে সংঘাতে নিহতের সংখ্যা ৮১৬। আহতের সংখ্যা ১০৪৬ জন। অপহরণ হয়েছে ১৬০৪ জন। বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে শতাধিক। তবে পাহাড়ের সাধারণ মানুষের ধারণা মতে এ সব সংখ্যা আরো বেশি। সরকারী সূত্রানুযায়ী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে গ্রেপ্তার হয়েছে প্রায় চার হাজারের মত। গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে ১২৫১টি। নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সন্ত্রাসীদের সম্মুখ যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে ৬০টিরও বেশি।

চারদলীয় ঐক্যজোট গঠন

আওয়ামী দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে, জয় লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে খালেদা জিয়ার

নেতৃত্বে ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট চার দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে। চারদলীয় জোটে প্রথমে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি শরিক ছিল। পরে এরশাদের নেতৃত্বের জাতীয় পার্টি চারদলীয় জোট ত্যাগ করলে দলের মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জুর এর নেতৃত্বে দলটির একটি অংশ চারদলীয় জোটে থেকে যায়। চারদলীয় জোট ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনেও জোটগতভাবে অংশ নেয় এবং দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয় লাভ করে।

বিডিআর কর্তৃক ১৬ জন বি এস এফ হত্যা

শেখ হাসিনার শাসনামলের শেষ ভাগে এপ্রিল মাসে ভারতের সীমান্ত বাহিনী কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীর বড়াই বাড়ির উপর হামলা করলে বিডিআর এর দেশপ্রেমিক বাহিনী আক্রমণকারীদের বীর বিক্রমে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং ভারত সীমান্ত বাহিনীর ১৬জন বিডিআর এর আক্রমণে নিহত হয়। দেশের সর্বস্তরের জনগণ বিডিআর এর বীরত্বে গর্ববোধ করেছে আর শেখ হাসিনা তার বন্ধু দেশের কাছে অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে বাংলাদেশের কপালে কলঙ্ক লেপন করেছে এবং ক্ষমতা হারানোর শেষ পর্যায়ে এসে বিডিআর প্রধানকে রৌমারীর ‘ধৃষ্টতার’ শাস্তি স্বরূপ ঐ পদ থেকে অপসারণ করেছে।

পীর সাহেব চরমোনাই রহ. এর আওয়ামী বিরোধী আন্দোলন

পীর সাহেব চরমোনাই রহ. আওয়ামী লীগকে একটি কুফরী শক্তি আখ্যায়িত করে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেন। তিনি বলেছিলেন, শেখ হাসিনা যখন হজ্ব করতে যায় তখন তাকে মুসলমান মনে হলেও কিন্তু যখন কলিকাতায় গিয়ে সিঁদুর পরে তখন তাকে হিন্দু মনে হয়। পীর সাহেব আরো বলেন, বিএনপি ভারতের দালাল আর আওয়ামী লীগ সরাসরি ভারত। ফতোয়া বিরোধী রায়ের প্রতিবাদে যখন আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে, শায়খুল হাদীস সাহেব হুজুর এবং আমিনী সাহেব হুজুর গ্রেপ্তার হন তখন পীর সাহেব হুজুর ছিলেন শরিয়ত পূর। আন্দোলনের কয়েকজন নেতা পীর সাহেব হুজুরের নিকট গিয়ে ঢাকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলে তিনি সফর সূচি কেন্দ্রিক মাহফিল পরিবর্তন করে ঢাকায় চলে আসলেন। রাজপথে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন। পল্টন ময়দানের মহাসমাবেশে কাফনের কাপড় মাথায় নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গিকার করলেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ

‘ইসলামী ঐক্যজোট’ চারদলীয় জোটে যোগদান করলে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোট থেকে বেরিয়ে যায়। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ হলো এই-

১. আদর্শগত বিরোধ, ২. বসুন্ধরা ইসলামিক রিচার্স সেন্টারে আয়োজিত মুফতিদের সম্মেলন থেকে চারদলীয় জোটে যোগদানের বিষয়ে নাজায়েজ ফতোয়া দেয়ায়, ৩. বেগম জিয়া কর্তৃক ইসলামী দাবীকে উপেক্ষা করা, ৪. নারী নেতৃত্ব।

ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন

২০০১ এর ১ অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম

পীর সাহেব চরমোনাই রহ. এর নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি মিলে ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়।

পীর সাহেব চরমোনাই কর্তৃক এরশাদের সাথে জোট করার কারণ

১. এরশাদ সাহেব পীর সাহেব চরমোনাই'র নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে ২. এরশাদ সাহেব অতীতের ভুল স্বীকার করেছে ৩. পীর সাহেব চরমোনাই ঘোষিত ৮ দফা দাবী মেনে নিয়েছে ৪. ক্ষমতায় গেলে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছে ৫. নারী নেতৃত্ব বর্জনের ওয়াদা দিয়েছে ৬. রওশন এরশাদসহ দলের নারীদেরকে বোরকা পরাতে সম্মত হয়েছে, ৭. ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ক্ষমতার রিমোর্ট হওয়ার প্রত্যাশা থাকার কারণে।

ইসলাম দেশ ও মানবতার কল্যাণে পীর সাহেব চরমোনাই ঘোষিত ৮ দফা দাবি

১. কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাস না করা, এবং বিদ্যমান কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পর্যাক্রমে সংশোধন করা, সেই সাথে সাংবিধানিকভাবে এর গ্যারান্টি ক্লোজ করা।

২. জাতীয় শরীয়া বোর্ড ও বিচার বিভাগে শরীয়া বেঞ্চ গঠন করা এবং আল্লাহ, রাসূল সা. এবং শরীয়াতের বিরুদ্ধে কটুক্তিকারীদের শাস্তির বিধান করা।

৩. আদর্শ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার সর্বস্তরে প্রয়োজনীয় দীনি শিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখা। নতুন প্রজন্মের নৈতিকতা রক্ষাকল্পে চরিত্র বিধ্বংসী অপসংস্কৃতি বন্ধ করা।

৪. ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করা। ভিক্ষুকদের সরকারীভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের কর্ম সংস্থান তৈরি করা।

৫. সন্ত্রাস, দুর্নীতি একটি জাতীয় গজব, এ গজব থেকে বাঁচার জন্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত দেশ গড়া। এ লক্ষ্যে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবাজদের আশ্রয়-প্রশ্রয় না দিয়ে তাদের সংসোধনের ব্যবস্থা করা। সংসোধন না হলে তদাদের মূলোৎপাটন করা।

৬. বেকারত্ব একটি জাতীয় বোঝা, অনগ্রসরতার প্রতীক। এ বোঝা থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে ব্যাপক শিল্পায়ন ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করে বেকারত্ব দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সার, ঔষধ ও বীজের দাম কমানো এবং গরীব কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

৭. নারী সমাজের যথাযথ সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘুদের সকল ধর্মীয় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও অধিকারের নিশ্চয়তা, সকল পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্মানজনক বেতন-ভাতা, আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।

৮. দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা বিধানকল্পে সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা।

ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এর প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার কারণ

১. পীর সাহেব চরমোনাই এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পক্ষে উলামায়ে কেরাম, ইসলামী জনতা, মুসল্লি-মুবাশ্লেগ, ইমাম-খতীব, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝাতে সক্ষম না হওয়া।

২. জমায়াতের অপপ্রচার ৩. জমায়াতী চক্রান্তের শিকার হয়ে হক্কানী উলামায়ে কেরাম কর্তৃক বিরোধীতা। ৪. আওয়ামী দালালীর অপবাদ ৫. আওয়ামী দুঃশাসন ও ধর্মবিদ্বেষের মুকাবালায় এক বাস্তব প্রয়োজনীয়তা অনুভব।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ

২০০১ এর নির্বাচনে চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন লাভ করার পর এরশাদ সাহেব থ্রেস্টার এড়াতে বিদেশে চলে যাওয়ার কারণে জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব রওশন এরশাদের হাতে চলে আসায় ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ঐক্যফ্রন্ট থেকে সরে যায়।

ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি গঠন

আওয়ামী সরকারের ধর্ম বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং ফতোয়া বিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার লক্ষ্যে জামায়াত ব্যতীত সব ইসলামী দলের সমন্বয়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য, আদর্শগত কারণে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোট থেকে বেরিয়ে গেলে ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে আওয়ামী সরকারের ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। অপর দিকে বিএনপি, জামায়াত ধর্মীয় ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলন থেকে বিরত থাকে। তখন আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনকে নিয়ে রাজনৈতিক জোটের বাহিরে জোট গঠনের প্রয়োজন পড়ে। কার্যত ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনই ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির ভেতর নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি স্থগিত হয়ে যাওয়ার কারণ

ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি অরাজনৈতিক সংগঠন। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের সময় এই শর্ত উল্লেখ ছিলো যে, এর ব্যানারে রাজনৈতিক তথা চারদলীয় ঐক্যজোটের পক্ষে কোন বক্তব্য-বিবৃতি দেয়া যাবে না। কিন্তু ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি সর্বস্তরের আলেম সমাজ এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মধ্যে একটি অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হলে ইসলামী ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দ শর্ত লঙ্ঘন করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির ব্যানারে চারদলীয় ঐক্য জোটের পক্ষে বক্তব্য-বিবৃতি দিতে শুরু করেন। এমনকি আমিনী সাহেবদের মুক্তির পর ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির এক সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীদের ঢুকতে দেয়নি। সেখান থেকে ফিরে এসে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অধ্যাপক এটিএম হেলায়েত উদ্দীনকে আহ্বায়ক করে নতুনভাবে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির ঘোষণা দেয়। এভাবে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি স্থগিত হয়ে যায়।

চারদলীয় জোট সরকারের ধর্মীয় কাজের ব্যর্থতা

চারদলীয় জোট সরকার ইসলামী মূল্যবোধের নামে ক্ষমতায় এসে অনেক বিধর্মী কাজ করেছে। ইসলামী মূল্যবোধের উপর কুঠারাম্বাধা করেছে। ইসলামী জোট

সম্পৃক্ত থাকা ইসলামী দলগুলো এর কোন প্রতিবাদ করেনি; বরং ক্ষমতার স্বার্থে তারাও সেগুলোকে সমর্থন দিয়েছেন বাধ্য হয়ে।

১. ফতোয়া বিরোধী রায় বাতিল করেনি ২. ফতোয়া বিরোধী রায় দানকারী দুই বিচারপতি গোলম রব্বানী ও নাজমুল আরা সুলতানার বিচার করেনি ৩. ফতোয়া বিরোধী রায় দানকারী দুই বিচারপতি গোলম রব্বানী ও নাজমুল আরা সুলতানার পদোন্নতি করেছে ৪. মদের দাম কমিয়েছে ৫. কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করেনি ৬. বি-বাড়িয়া ট্রাজেডিতে শাহাদাত বরণকারী শহীদদের রক্তের উপর পা দিয়ে ক্ষমতায় এসে হত্যাকারীদের বিচার করেনি ৭. মালিবাগ বাইতুল আজীম জামে মসজিদের জায়গা দখলকারী বিএনপি নেতা তৌফিকের বিচার করেনি ৮. মালিবাগ জামে মসজিদ রক্ষার মিছিলে গুলি করে তিনজন হাফেজে কুরআন ও একজন মুসল্লিসহ চারজনকে শহীদ করেছে ৯. শহীদদের লাশ নিয়ে টালবাহানা করেছে এমনকি এর প্রতিবাদ করারও সুযোগ দেয়নি ১০. হাফেজে কুরআনদের হত্যাকারীদের কোন বিচার করেনি ১১. নিজামীর ইসলাম বিরোধী ফতোয়া : ২০০১ সালের ২৬ অক্টোবর টঙ্গিতে এক কর্মী সম্মেলনে মাওলানা নিজামী ফতোয়া জারি করেন, “জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক হারাম নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মোবাহ বৈধ। তিনি আরো বলেন, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব হারাম নয় বরং এরশাদের মত পুরুষ নেতৃত্বের থেকে উত্তম। ১২. মুজাহিদের পূজায় গমন : হিন্দুদের বড় পূজার একটি উৎসবে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল, সরকারের সমাজ কল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন জামায়াতের এই শীর্ষনেতাকে পূজা মণ্ডপে হিন্দু রমণী এবং যুবতীরা ফুলের মালা ও পাপড়ি দিয়ে বরণ করেছে। ১৩. ইমাম সম্মেলনে ম্যারির বয়ান : বিশ্ব মুসলিমের এক নাম্বার দুশমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ মহিলা রাষ্ট্রদূত ম্যারি এ্যান পিটার্স অর্থ উলঙ্গ খ্রিস্টান নারী হাজীক্যাম্পে মুখোমুখি উপস্থিত হয়ে ধর্মগুরু শ্রদ্ধাভাজন ইমাম সাহেবদেরকে নসীহত করলো ইসলামী মূল্যবোধের বাণীবাহী সরকারের আয়োজনে।

১৪. চারদলীয় ঐক্যজোটের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় ঢাকার একটি কওমী মাদরাসার স্মারকের প্রচ্ছদে বেগম জিয়ার রঙিন ছবি শোভা পেয়েছে। ১৫. ২০০৪ সালের ১৭ জানুয়ারি বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট চরমমোনাই’র হযরত পীর সাহেবের চার ছেলেসহ একটি সাজানো মামলার রায়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ২১ জন নেতা-কর্মীকে পাঁচ বছরের দণ্ডদেশ দিয়েছে। মামলার বাদি চরমোনাই ইউনিয়নের পরাজিত চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আবদুস সালাম রাঢ়ী।

২০০২ সালের ডিসেম্বর উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১. ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে আবদুস সামাদ আজাদের বাসায় রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর গমন। ২. জাপা নেতা কাজী জাফরুল্লাহ ইফতার পার্টি। ৩. শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ১২টি দুর্নীতি মামলা দায়ের। ৪. শেখ মুজিবের জন্ম ও মৃত্যু দিবসে সরকারী ছুটি বাতিল। ৫. মুজিব পরিবারের হেফাজতের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা আইন বাতিল, ৬. উপ-নির্বাচনে নড়াইলে দুই আসনে মুফতি শহীদুল ইসলামের মনোনয়নকে কেন্দ্র করে শায়খুল হাদীস সাহেব হুজুর ও আমিনী সাহেবের মধ্যে বিতর্ক। ৭. গ্যাস রপ্তানীতে

হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা। ৮. ঘাদানিক নেতা শাহরিয়ার কবিরের জামিন না মঞ্জুর।

৯. খতীব উবায়দুল হক সাহেবের ব্যাপারে মার্কিন দুতাবাসের অশোভন উক্তি।

১০. দেশের বিভিন্ন স্থানে গণপিটুনিতে মারার হিড়িক। ১১. সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির দায়ে বিলুপ্ত ঘোষিত ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দিন পিন্টু এমপি গ্রেপ্তার।

২০০২ সালের ২৯ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে ‘নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও জাতীয় উন্নয়নে সার্বজনীন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প নেই’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র আন্দোলনের সেমিনারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর এ. কে. এম. মহিউদ্দীন বলেন, “পশ্চিমারা পূর্ব পাকিস্তানকে যে শোষণ করেছে, ঢাকা এর চেয়ে বেশি শোষণ করেছে গোটা দেশকে।”

২০০৩ এর জুনে জাতীয় বাজেটের সবচেয়ে বড় চমক ছিলো মদের দাম কমানোর প্রস্তাব এবং মন্ত্রী-এমপিদের বেতন বাড়িয়ে ইজ্জত বৃদ্ধি। বিদেশীদের কাছে মন্ত্রী-এমপিদের এত কম বেতন-ভাতার কথা বলতে নাকি লজ্জাবোধ হয়। এজন্য উক্ত বাজেটে মন্ত্রী-এমপিদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়। তখন কেহ কেহ বলেছিল, মন্ত্রীদের চুরি বাটপারীর কথাও তো বিদেশীরা শুনে এবং জানে, এতে আপনাদের শরম লাগে না?

২০০৪ এর ২ এপ্রিল ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মহাসমাবেশে দলের আমীর আমীরুল মুজাহিদীন সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই জাতীয় ঐক্যের ডাক দেন এবং সমাবেশ থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবে মুক্তমঞ্চসহ ৬ বিভাগের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

২০০৪ এর ২১ আগস্ট থ্রেনেড হামলা ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় ১১টি শক্তিশালী থ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। উক্ত থ্রেনেড হামলায় ১৯ তম রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের স্ত্রী বেগম আইতী রহমানসহ ২৪জন নিহত এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩০০জন আহত হয়। নিহতদের ১২জন ঘটনাস্থলে এবং বাকি ১২জন হাসপাতালে মারা যায়। উক্ত থ্রেনেড হামলায় তৎকালীন উপ-মন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, লুৎফুর রহমান বাবর, হুজিনেতা মুফতি হান্নানকে অভিযুক্ত করে মামলা করা হয়।

২০০৪ সালের ১৮, ১৯, ২০ মে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও কায়েমী স্বার্থবাদবিরোধী মুক্তমঞ্চ দেশ যখন দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের খেতাব অর্জন করে, দেশের রাজত্ব যখন সন্ত্রাসীদের কবলে নিপতিত হয় এবং দু’টি কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছে যখন দেশের মানুষ যিম্মি হয়ে যায় তখন তিনটি জাতীয় সমস্যার বিরুদ্ধে দল, মত ও ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৮, ১৯, ২০ মে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর হযরত পীর সাহেব চরমোনাই’র আহ্বানে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, শ্রমজীবী ও পেশাজীবীদেরকে নিয়ে জাতীয় ঐক্যমঞ্চের ডাক দেন। পীর সাহেব চরমোনাই’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩ দিনের মুক্তমঞ্চ দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, শ্রমজীবী ও পেশাজীবীরা বিপুলভাবে সাড়া দেয়।

দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান : বেগম খালদা জিয়ার আমলে ২০০১-২০০৫ পর্যন্ত ‘ট্রান্সপারেন্স ইন্টারন্যাশনাল’ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ পরপর পাঁচবার

দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের খেতাব লাভ করে।

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় জেএমবি কর্তৃক সিরিজ বোমার হামলা হয়।

২০০৬ ড. ইয়াজ উদ্দীন আহমেদ, ২০০৭-৮ ড. ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের সংবিধানানুযায়ী একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে একটি নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এ স্বল্পস্থায়ী সরকার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে এবং নীতি নির্ধারণী কার্যকাল থেকে বিরত থাকে।

যাতে এ সরকারের কার্যাবলী নির্বাচনের ফলাফলে কোন প্রভাব সৃষ্টি না করে। অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে।

২০০৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

২০০৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং এর বিলুপ্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নিম্নে এ সরকারের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো-

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও উপদেষ্টা নিয়োগ : ২৯ অক্টোবর ২০০৬ সংবিধানের ৫৮ (গ) অনুচ্ছেদের ৬ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজ উদ্দীন আহমদ স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজ উদ্দীন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

২. নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিরোধী দলের দাবী অনুযায়ী ভোটের তালিকা হালনাগাদ করে। ২২ জানুয়ারি ২০০৭ তফসীল ঘোষণা করলে বিরোধী দলীয় মহাজোট তা প্রত্যাহার করে।

৩. চার উপদেষ্টার পদত্যাগ ও নতুন চার উপদেষ্টা নিয়োগ : প্রধান উপদেষ্টা তথা ড. ইয়াজ উদ্দীন আহমেদের পক্ষপাতমূলক আচরণ, এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাজনৈতিক সংকট নিরসনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতা, রাষ্ট্রপতির স্ত্রী ড. আনোয়ারা বেগমের অফিসিয়াল তদারকি, তথ্যসচিবের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত থাকা, পরবর্তীতে তাকে তথ্য উপদেষ্টা বানানো প্রভৃতি কারণে উপদেষ্টারা দায়িত্ব পালনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলেন না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৬ সালের ১১ ডিসেম্বর চার উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান, হাসান মশহুদ চৌধুরী, সি এম শফি সামি ও সুলতানা কামাল পদত্যাগ করেন এবং তাদের শূন্যপদে নতুন উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হন ড. শোয়েব আহমেদ, সফিকুল হক চৌধুরী, প্রফেসর মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন খান এবং মেজর জেনারেল (অব.) রুহুল আলম চৌধুরী।

৪. প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ : মহাজোটের নির্বাচনে বয়কট, লাগাতার আন্দোলন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, সরকারের প্রতি জাতিসংঘের সমর্থন প্রত্যাহার এবং জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি

বন্ধের হুমকির পরিস্থিতিতে তিন বাহিনীর প্রধানগণ রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেন এবং জাতীয় স্বার্থে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রপতি তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ঐ দিন অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পদত্যাগ করেন। তিনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং গভীর রাতে জাতির উদ্দেশ্যে তার ব্যর্থতার দায়ভার স্বীকার করে ভাষণ দেন।

২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

ড. ইয়াজুদ্দীন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভেঙ্গে যাওয়ার পর ২০০৭ সালে পুনরায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। নিম্নে এ সরকারের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ তুলে ধরা হলো-

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও উপদেষ্টা নিয়োগ : ১২ জানুয়ারি ২০০৭ নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ। নবগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, মেজর জেনারেল (অব.) এম. এ. মতিন, তপন চৌধুরী, গিতিয়ারা শাফিয়া চৌধুরী, আনোয়ারুল ইকবাল, ড. সি এস করীম, ড. এ. বি. মির্জা আজীজুল ইসলাম, ড. ইফতিখার আহমেদ চৌধুরী, আইয়ুব কাদেরী ও মেজর জেনারেল (অব.) ডা. এ এস মতিউর রহমান।

২. জরুরি অবস্থাকালীন গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার : ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের সরকার জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে গঠিত হয়। এটিই প্রথমবারের মত বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা চলাকালে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। উল্লেখ্য, বিরোধী দলের আন্দোলনে দেশে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিলো তা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজুদ্দীন আহমেদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং ১২ জানুয়ারি ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের সরকার গঠিত হয়।

৩. বিশেষ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার : সংবিধানে উল্লিখিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত সরকারের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ এবং নির্বাচিত সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। কিন্তু ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের সরকার এ থেকে ব্যতিক্রম। একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হওয়ার পর এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। তাছাড়া সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য ধারাক্রম অনুযায়ী যে সব শর্ত রয়েছে এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এ জন্য এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিশেষ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয়।

৪. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী নিয়োগ : প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় উপদেষ্টা নিয়োগ না করে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টা তার বিশেষ সহকারী হিসেবে পাঁচজনকে নিয়োগ দেন। এরা হলেন- অধ্যাপক এম তামিম, চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবশীষ রায়, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম এ মালেক, মানিক লাল সমাদ্দার ও মাহবুব জামিল।

বাংলাদেশ ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সফলতা

১. নির্বাচন কমিশন সংস্কার : নির্বাচন কমিশন দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের উপর একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য

নির্বাচন নির্ভর করে। জোট সরকার নির্বাচন কমিশনকে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলো। যার কারণে বিরোধী দলগুলো বারবার নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবি জানায়। কিন্তু জোট সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। এমনকি ড. ইয়াজ উদ্দীন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারও নির্বাচন কমিশনকে পুরোপুরি সংস্কার করেনি। কিন্তু ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরই ২২ জানুয়ারি ২০০৭ বিতর্কিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজীজ এবং ২৯ জানুয়ারি সকল নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ আরো দুইজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেয়। ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণাঙ্গ ও একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সংস্কার : বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরিচালনা করে। কিন্তু জোট সরকার এ প্রতিষ্ঠানে দলীয় লোক নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলো। ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে সংস্কার করে এবং নতুনভাবে কমিশনকে ঢেলে সাজায়।

৩. দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ : ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ থেকে শুরু হয় দুর্নীতি বিরোধী অভিযান। সরকার বড় বড় দুর্নীতিবাজদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের অনেককে শাস্তি প্রদান করেছে। অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে আইনের উর্ধ্বে মনে করতো তারা এখন দুর্নীতির দায়ে কারাগারে বন্দি রয়েছে। বিশেষ করে বিগত দুই শাসনামলের সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রিসহ প্রায় দুই'শ এর বেশি প্রভাবশালী নেতা দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে। তাছাড়া ব্যবসায়ী, আমলা, চাকরিজীবীসহ সকল ধরনের দুর্নীতিবাজদেরকে সরকার গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

২০০৭-০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যর্থতা

১. দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি : ২০০১-০৬ সালের জোট সরকারের শাসনামলেই দেশে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি হয়েছিলো। ২০০৭-০৮ সালের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এমনকি সরকার বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রেও সফলতার পরিচয় দিতে পারেনি।

২. নির্বাচনকে বিলম্বিত করা : বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো সূষ্ঠ, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বিলম্বিত করেছে। আর নির্বাচন বিলম্বিত হওয়া দেশের গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ।

৩. রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের ঘরোয়া রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিছু দিন পর শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিলেও পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করে। তাই রাজনীতিতে নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপও বন্ধ হয়। যা গণতন্ত্র চর্চার প্রতিবন্ধক।

৪. দুই মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশে

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে দুই মাসেরও বেশি সময় বন্ধ রাখেন যা কারোরই কাম্য ছিলো না।

২০০৮ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত শেখ হাসিনার শাসনামল

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো মহাজোট কর্তৃক বর্জনের ঘোষণা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং দু’টি জোটের অনড় অবস্থানের কারণে ওয়ান ইলিভেনের সূত্রপাত হয়। তারই প্রেক্ষিতে ড. ফখরুদ্দীনরা দুই বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অতপর ২০০৮ এর ২৯ ডিসেম্বর এক নাটকীয় নির্বাচনের মাধ্যমে মহাজোট দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন অধিকার করে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। দুই জোটের বাহিরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রথম একক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৬৫ আসনে প্রার্থী দিয়ে প্রায় ৮ লক্ষ ভোট পান। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। সম্ভ্রাস, দুর্নীতিতে অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে। দেশে এক নায়কতন্ত্র কায়েম করে জনগণের বাক স্বাধীনতা হরণ করে। মহাজোটের এ শাসনামলে একের পর এক বহু লোমহর্ষক ঘটনা ঘটতে থাকে। জোটের শরিক বামদলগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সরকার ইসলাম বিরোধী অনেক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। সংবিধান থেকে আত্মাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস তুলে দেয়। বিতর্কিত নারীনীতি, সেকুলার শিক্ষানীতি প্রণয়ন, রেলমন্ত্রীর অবৈধ চাকুরি বাণিজ্য, পদ্মাসেতুর দুর্নীতি, হলমার্ক কেলেঙ্কারি, ৫ মে শাপলা চত্বরে সরকারের পেটোয়া বাহিনীর তাণ্ডব যা দেখে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাতের কথা মনে পড়ে। ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারি পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোন নজির নেই এমন এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন, যা গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাতের শামিল। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম পীর সাহেব চরমোনাই’র ভাষায় “৫ জানুয়ারির নির্বাচন দ্বারা প্রমাণিত হলো জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস নয়।”

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রক্তাক্ত পিলখানা

পিলখানায় ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংঘটিত সমসাময়িক ইতিহাসের নজিরবিহীন ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। অস্তিত্ব বিরোধী শক্তিই ঘটিয়েছে, যা বাংলাদেশের ভিত্তিমূলে চরম ঝাঁকুনি দিয়ে এর সীমান্ত পাহারা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনাকে নড়বড়ে করে ছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে অকেজো করা।

২০১২ সালে মানবাধিকার পরিস্থিতি

আইন বিচার ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর প্রতিবেদন :

বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াছ আলী, শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামসহ ৫৬ জন নিখোঁজ, অপহরণ ও গুলি হত্যার শিকার হয়েছে। এ বছর ৫৯৫টি রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। এসব সংঘাতে ৮৪জন নিহত ও ১০ হাজার ৫২৫জন আহত হয়েছে। ২০১১ সালে এ ঘটনার সংখ্যা ছিলো ৩৭৫টি। ২০১২ সালে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে ৯১জন। এ বছর ৩১৯টি সীমান্ত অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, হত্যার শিকার হয়েছে ৪৮জন, নির্যাতনে আহত হয়েছে

১০৬জন। এবছর ২৫০জন নারী বখাটেদের হাতে লাঞ্চিত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১৬জন আত্মহত্যা করেছেন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় ২১৫জন হামলার শিকার হন। এর মধ্যে দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত হন ১৫জন। এ বছর ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১৪৯জন নারী ও শিশু। যার মধ্যে ৭৯জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। আত্মহত্যা করেন আরো ১৪জন। ৬৮জন নারী এসিড নিক্ষেপের শিকার হন। পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা ছিলো ২০১২ সালে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পুলিশের নির্যাতনে কুষ্টিয়ার মাহবুবুল হোসেনের মৃত্যু, বিএর কলেজের ছাত্র মাহমুদুল হক টিটোকে খুলনার কোতয়ালী থানায় বুলিয়ে নির্যাতন করা হয়। এ বছর সাগর-রুণিসহ ৫জন সাংবাদিক খুন হয়েছে। এছাড়াও ৪৪২জন সংবাদকর্মী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হন।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি : বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই কুদরত-এ-খুদা কমিশন (১৯৭৪) ও শামসুল হক (১৯৯৭) শিক্ষানীতির (২০০০) আলোকে একটি নতুন শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়া (২০০৯) ওয়েবসাইটে প্রদান করে, এ বিষয়ে জনগণের মতামত চাওয়া হয়। বিভিন্ন মহল সে বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনা করে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। কিন্তু জনগণের প্রদত্ত সে সব মতামতকে গ্রহণ বা বর্জনের কোন সংখ্যাভিত্তিক তথ্য ও ব্যাখ্যা না দিয়ে এর কিছু শব্দ ও টার্ম পরিবর্তন করে শিক্ষানীতি ২০১০ চূড়ান্ত করা হয়। আর তা বিগত ৩ অক্টোবর ২০১০ জাতীয় সংসদে পাস করার জন্য বিল আকারে উপস্থাপন করা হয়।

শিক্ষানীতি ২০১০ এর প্রাক কথনে দাবি করা হয়েছে ‘এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারীগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে’। অথচ বাস্তবতা তা নয়। লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, শিক্ষানীতি ২০১০ এর কোথাও কোথাও ‘ধর্মশিক্ষা’ ও ‘নৈতিক শিক্ষা’ প্রভৃতি শব্দ যোগ করা হয়েছে এবং ‘ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা’ নামে একটি অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মূলত জনগণকে বুঝানো হয়েছে যে, ‘শিক্ষানীতি ২০১০-এ ধর্মশিক্ষা রাখা হয়েছে।’ কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিকের শিশু শ্রেণি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার কর্মকোশলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

ভারতীয় কাঁটাতারে বুলছে ফেলানীর লাশ : ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি বিএসএফ বিশ্বব্যাপী আলোচিত নিন্দিত এক হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে ভারতের কোচবিহার জেলার অন্তর্গত চৌধুরীহাট সীমান্ত চৌকির কাছে কাঁটাতারের বেড়া পার হওয়ার সময় হত্যা করা হয় ফেলানীকে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার মত তার লাশ বুলে থাকে কাঁটাতারে। মাটির দিকে মাথার চুল আর উপরের দিকে পা। এমন অবস্থায় কাঁটাতারে বুলা ছবিটি অশ্রু ঝরায় বিশ্বের বিবেকমান প্রত্যেক নাগরিকের। বিএসএফের কনস্টেবল অমিয় ঘোষ খুব কাছে থেকে গুলি করে তাকে হত্যা করে। ভারতের কোচবিহার সোনারি বিএসএফ ছাউনিতে অমিয় ঘোষের বিচার শুরু হয় ২০১৩ এর ১৩ আগস্ট। স্বাস্থ্য দিতে বাংলাদেশ থেকে সেখানে যান ফেলানীর পিতা ও মামা। ৫ সেপ্টেম্বর শেষ হয় বিচার কাজ। আদালত অমিয়কে নির্দোষ বলে রায় দেন। এ রায়ের পর ফেলানী হত্যা নিয়ে আবারও বিশ্বব্যাপী নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় উঠে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী : ২০১১ সালের ৩০ জুন ও ৩ জুলাই বাংলাদেশের মুসলমানদের ইতিহাসে কালো দিবস হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২০১০ এর ২১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাবে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ২৭টি বৈঠকের মাধ্যমে ৫১ দফা সুপারিশ সম্বলিত সংবিধান সংশোধন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান এর নিকট পেশ করে। ২৫ জুন ২০১১ সংসদে বিল আকারে উত্থাপন করে। পরবর্তীতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ২৯ জুন ২০১১ চার দফা সংশোধনীসহ মোট ৫৫টি দফা সম্বলিত বিলটির প্রতিবেদন পেশ করে। ৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে বিলটি অনুমোদিত হয়। এরপর ৩ জুলাই ২০১১ রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান সেই বিলে স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয় ‘সংবিধান (পঞ্চদশ) সংশোধনী বিল ২০১১’ এর মাধ্যমে সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর থেকে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস তুলে দিয়ে তদস্থলে ‘সেকুলারিজম’ তথা ধর্মহীনতা প্রতিস্থাপন করা হয়।

নারী উন্নয়ননীতি ২০১১ : সরকার নারীনীতিমালা ২০১১ এর খসড়া মন্ত্রীসভায় অনুমোদন করেছেন। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, আলেম সমাজ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ দাবি করছেন, নারীনীতি সংশোধন কিংবা বাতিল করতে হবে। কারণ, নারী নীতিমালার মূল প্রেরণা ও ভাবধারা ইসলামী জীবনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে সিডো সনদের বিতর্কিত অংশগুলো শরীয়ত বিরোধী ভাবধারা সম্বলিত একটি ঘুমন্ত এটম বোমা। অপর দিকে সরকার বিশেষ করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, আইন প্রতিমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রী বলেছেন, নারী নীতিমালায় ইসলাম বিরোধী কোন ধারা নেই। প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, নারী নীতিতে ইসলাম বিরোধী কিছু নেই। এ নিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা যেমন বিভ্রান্ত হয়, আলেম-উলামা ও ইসলামী জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মিছিল-মিটিং, প্রতিবাদ-সমাবেশ এবং হরতালও করে। এটা একদিকে এ সরকারের আমলের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সাথে সাথে সরকারের ধর্মবিরোধী পদক্ষেপ সমূহেরও অন্যতম।

চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন : সকল জল্পনা কল্পনা ও উত্তাপ উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত ২০১৩ সালের ১৫ জুন শনিবার দেশের চারটি সিটি কর্পোরেশনে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেনাবাহিনী মোতায়েন ছাড়া শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ চারটি সিটি কর্পোরেশনে একযোগে এমন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। এই কৃতিত্বের জন্য বর্তমান নির্বাচন কমিশন অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার না করে দায়িত্বশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়ায় ক্ষমতাসীন সরকারকেও সাধুবাদ জানাতে হয়। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের একজন কর্মীর দুঃখজনক মৃত্যু এবং কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া চারটি সিটি কর্পোরেশনেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করায় সকল পক্ষের কর্মী, সমর্থক এবং সর্বস্তরের ভোটারগণও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। নির্বাচনে চারটি সিটি কর্পোরেশনেই ১৮ দলীয় জোট সমর্থিত বিএনপি প্রার্থী বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। পরাজিত ১৪ দলীয় জোট সমর্থিত আওয়ামী লীগের চারজন প্রার্থীই নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিয়েছে। এটিও এ নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য ভালো

দিক। আমরা চার সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়রকে শুভেচ্ছা জানাই। পাশাপাশি পরাজিত প্রার্থীদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাই পরাজয় মেনে নিয়ে রাজনীতিতে একটি ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। চারটি সিটি কর্পোরেশনেই সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয় এবং বিরোধীদল সমর্থিত প্রার্থীদের বিপুল বিজয় ক্ষমতাসীন সরকারের জন্য অবশ্যই একটি সতর্কতা।

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর : ২০১৩ সালের এ সময়টা বাংলাদেশের ইতিহাসে নানাভাবে আলোচিত। ৫ ফেব্রুয়ারি ট্রাইব্যুনাল ২ কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে আনা ৬টি অভিযোগের মধ্যে ৩টিতে ৫বছর করে ১৫ বছরের জেল এবং চতুর্থটিতে খালাস এসব নিয়ে ছিলো টানটান উত্তেজনা বিরাজমান। শাহবাগে ইমরানরা জড়ো হয়েছে, সংবিধান সংশোধন হয়েছে, রাজিবরা বিশ্বনবী সা. কে নিয়ে কটুক্তি করেছে, হেফাজত এসেছে, লংমার্চ করেছে, অবরোধ করেছে, শাপলায় অবস্থান নিয়েছে, সরকার গণহত্যা করেছে।

মন্ত্রীদের পদত্যাগ ও সাংবিধানিক বিতর্ক : ১১ নভেম্বর ২০১৩ জাতি দেখলো সংবিধানিক ধারাকে অবজ্ঞা করে কীভাবে মহাজোট সরকার তামাশা করলো! টেলিভিশনে লাইভ প্রচারিত হলো, মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। ১১ নভেম্বর ২০১৩ প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অপর সব মন্ত্রীর পদত্যাগের তথ্য সরকারীভাবে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব মুহাম্মদ মোশররফ হোসেন ভূঞা। ১৪ নভেম্বর ২০১৩ পদত্যাগের পর সুযোগ-সুবিধা এবং প্রটোকল না নিতে ৩৯জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে লিগেল নোটিশ দিয়েছেন সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ড. তুহিন মালিক। সংবিধানের ৫৮ (১) অনুচ্ছেদের বিবরণ দিয়ে নোটিশের এক অংশে বলা হয়েছে, এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র দাখিলের পর মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা আর তাদের পদে বহাল নেই। কিন্তু পদত্যাগের পরও জাতীয় পতাকাবাহী সরকারী গাড়ি ব্যবহার করেন মন্ত্রীরা। নিজ নিজ দপ্তরে গিয়ে অফিসের কাজও যথারীতি সম্পাদন করেন তারা।

২০১৪ এর ৫ জানুয়ারীর নির্বাচন এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি

১. ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রফিক উদ্দীন আহমেদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ৫ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। তার এই ঘোষণা যে দেশকে অনিবার্য সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২. তথাকথিত এই তফসীল ঘোষণার পরপরই ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি।

৩. এইচ এম এরশাদ মহাজোট ছাড়ার ঘোষণা দেয়ায় তাকে সামরিক হাসফাতালে আটকে রেখে রওশনা এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়।

৪. জাতিসংঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, কানাডা, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্নদেশ ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতেও বাংলাদেশের সংকট নিরসনে সব দলের অংশ গ্রহণে নির্বাচনের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৫. ২০১৩ এর ১৩ ডিসেম্বর পূর্বঘোষিত নির্বাচনী নির্ধিষ্ট অনসারে মনোনয়ন

প্রত্যাহারের শেষ দিনে দেখা গেল বাংলাদেশ সংসদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ১৫৪টি কেন্দ্রে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় হয়েছেন।

৬. ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারিকে গণতন্ত্রের বিজয় দিবস আখ্যা দিয়ে বিজয় উৎসব করার কর্মসূচি দিয়ে ছিলো আওয়ামী লীগ। আর দিনটিকে গণতন্ত্র হত্যা দিবস হিসেবে পালন করতে নয়। পল্টনে সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়ে সরকারের বাধায় তা পালন করতে পারেনি বিএনপি।

তথ্যপুঞ্জী :

১. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা
২. ডিহি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তৃতীয় পত্র, বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি
৩. মাসুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, ঢাকা : প্রকাশক-মাহমুদ কলি, ১৯৯১
৪. বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব
৫. অপসংস্কৃতির বিভীষিকা, ১ম খণ্ড
৬. জিহাদ ও ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে
৭. মুজাহিদ হাসান তাদনান, বি বাড়িয়া ট্রাজেডি, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০১, ঢাকা, হৃদয় প্রকাশন, ২০০১
৮. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ পর্যালোচনা মন্তব্য ও পরামর্শ, বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ
৯. বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট

.....
লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও গ্রন্থপ্রণেতা

বাংলাদেশের সংবিধান একটি পর্যালোচনা

শেখ ফজলুল করীম মারুফ

ভূমিকা

সংবিধান হলো কোন জাতির পরিচালনার জন্য মৌলিক মূলনীতি এবং আইনগুলোর সমষ্টি, একটি রাষ্ট্র কিভাবে চলবে, দেশের সরকার কাঠামো কি হবে, সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর আকার-ধরণ-ক্ষমতা কি হবে, রাষ্ট্রের অধিবাসীরা কি অধিকার ভোগ করবেন, কোন মূলনীতির ওপরে দেশ পরিচালিত হবে ইত্যাদি বিষয়ে যে মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং যাকে সে দেশের অপরিবর্তনীয় ও সর্বোচ্চ আইন বলে স্বীকার করা হয় তাই সংবিধান। প্রতিটি দেশের জন্য সংবিধান জরুরি, সংবিধান ছাড়া কোন দেশের কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশেরও একটি সংবিধান রয়েছে। বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে স্বাধীনতার মাত্র এক বছর পরেই একটি সংবিধান তৈরি করতে পেরেছে। বাংলাদেশের সংবিধান অনেক বিবেচনাতে প্রশংসনীয় হলেও সংবিধান রচনার সময় থেকেই নানা বিতর্ক উঠেছে। যারা সংবিধান রচনার দায়িত্ব ছিল তাদের আইনগত অধিকার নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে, তেমনি সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারণ করা, সংবিধান রচনার সময় ভিন্নমত গ্রহণ না করা, সকল দলের উপস্থিতি না থাকা এবং বারংবার দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধানের সংশোধনী নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্ন আছে, সংবিধানের বিভিন্ন ধারার সাথে অন্য ধারার সাংঘর্ষিক অবস্থান এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো বাংলাদেশের সাধারণ জনতার মূল্যবোধের প্রতিফলন না ঘটায় সংবিধান নিয়ে অতৃপ্তি রয়েছে। এখানে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হবে।

সংবিধান প্রণয়ন এর প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরই বাংলাদেশের সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। কারণ পরাধীন কোন দেশের নিজস্ব সংবিধান রচনার অধিকার থাকে না। প্রভু দেশ যে সংবিধান চাপিয়ে দেয় সেই সংবিধানেই মেনে চলতে হয়। এই ভূখণ্ডের মানুষের দুর্ভাগ্য যে, এই ভূখণ্ডের মানুষের মতামত নিয়ে তাদের মূল্যবোধের প্রতি

সম্মান জানিয়ে কোন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়নি। সেই অতীতকাল থেকেই কখনো আর্ঘরা, কখনো সেন, পাল, দ্রাবিড়, সুলতান, তুর্কি, মোঘলরা এবং ইংরেজরা আমাদের সংবিধান রচনা করে দিয়েছে। ১৯৪৭ সালে এই অঞ্চলের মানুষের মতামত নিয়ে একটি স্বাধীন দেশ পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানের শাসকরা হটকারিতা ও গোঁড়ামী করে সংবিধান রচনায় গড়িমসি করে এবং শেষে যা করেছে তা তাদের মন মতো এবং যাচ্ছে তা। যার ফলশ্রুতিতেই এই ভূখণ্ডের মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটে, যা ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে সশস্ত্র যুদ্ধে রূপান্তরিত হয় এবং নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে স্বাধীনতা লাভ করে এবং বাংলাদেশ নিজস্ব সংবিধান রচনা করার অধিকার লাভ করে।

সংবিধান

প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব কিছু আইন-কানুন, নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এসকল নিয়ম-নীতিসমূহই হল ঐ সকল রাষ্ট্রের সংবিধান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল বলেন, “সংবিধান হল এমন একটি জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র তার নিজের জন্য বেছে নিয়েছে।”

লর্ড ব্রাইস বলেন, “সংবিধান হল এমন কতগুলো আইন ও প্রথার সমষ্টি যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হয় অথবা এমন কতিপয় আইনের সমন্বয় ঘটে যাতে সম্প্রদায়কে সংগঠিত, শাসন এবং একত্রীকরণের নীতিমালা এবং নিয়ামবলি সংযোজিত হয়।”

বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে মিত্র বাহিনীর কাছ থেকে সরকার ঢাকায় ক্ষমতা গ্রহণ করে; যে সরকার ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ইউসুফ আলীর শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়। এরপর স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করেন। আদেশের ভাষা ছিল নিম্নরূপ:-

“যেহেতু ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্র আদেশের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসন পরিচালনার জন্য অস্থায়ী বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল; এবং যেহেতু উক্ত ঘোষণাপত্র রাষ্ট্রপতির সকল নির্বাহী এবং আইন প্রণয়নগত ক্ষমতা এবং একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল; এবং যেহেতু উক্ত ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধের অবসান বর্তমানে ঘটেছে; এবং যেহেতু উক্ত বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত আকাঙ্ক্ষা এই যে, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকরী করা হবে; এবং যেহেতু উক্ত লক্ষ্য অনুযায়ী এক্ষেত্রে অবিলম্বে কতগুলো বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন; সেহেতু এখানে রাষ্ট্রপতি অনুগ্রহপূর্বক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র আদেশ এবং এতদুদ্দেশ্যে তাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতার অনুসারে নিম্নোক্ত আদেশ প্রণয়ন এবং জারি করেছেন।”

১. এই আদেশ বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২ নামে অভিহিত।
২. এটি সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে।
৩. এটি অবিলম্বে বলবৎ থাকবে।
৪. সংজ্ঞা : এই আদেশে বর্ণিত গণপরিষদ বলতে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি এবং ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোতে বিজয়ী এবং আইনের দ্বারা বা অধীনে অন্যদিকে অযোগ্য বিবেচিত নন, বাংলাদেশের এমন সকল নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত পরিষদকে বুঝাবে।
৫. বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে এবং সেই মন্ত্রিপরিষদের প্রধান থাকবে প্রধানমন্ত্রী।
৬. রাষ্ট্রপতি তার সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।
৭. রাষ্ট্রপতি এমন একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন যিনি গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা অর্জন করতে পারবে। অন্য সকল মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিযুক্ত হবেন।
৮. গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণীত হওয়ার পূর্ববর্তী কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে, মন্ত্রিপরিষদ বাংলাদেশের একজন নাগরিককে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবেন। তিনি গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান অনুসারে অপর একজন রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন।
৯. বাংলাদেশে একটি হাইকোর্ট থাকবে। একজন বিচারপতি নিযুক্ত হবেন এবং সময় সময়ে নিযুক্ত হতে পারেন এমন অন্যান্য বিচারককে নিয়ে হাইকোর্ট গঠিত হবে।
১০. বাংলাদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিগণকে রাষ্ট্রপতি শপথ পাঠ পরিচালনা করবেন এবং রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের শপথ পাঠ পরিচালনা করবেন। শপথ বাক্যের ফরম মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা নির্ধারিত হবে।
- সে আদেশানুযায়ী পূর্বে ১৯৭০ এর নির্বাচনের নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্য এবং প্রাদেশিক সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদে আদেশ ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ জারি হয় এবং তা কার্যকর হয় ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ থেকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত ৪৬৯ এর (জাতীয় পরিষদে ১৬০ জন আর প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ জন) ৪০৩ জন নিয়ে গঠিত হয়। কারণ ৪৬৯ জনের ভিতর ১২ জন মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত হন, দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন ৫ জন। দুর্নীতির জন্য আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত হন ৪৬ জন এবং ২ জন পাকিস্তান সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিল। আর পররাষ্ট্রে মন্ত্রণালয়ে চাকুরী নেন একজন। ৪০৩ জনের ভিতর ৪০০ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের আর ১ জন ছিলেন ন্যাপের আর ২ জন ছিলেন নির্দলীয়। সেই পরিষদের স্পীকার হন শাহ আব্দুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পীকার হন মোহাম্মদ উল্যাহ। আর ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের গণপরিষদ আদেশ

জারি করেন। ১১ এপ্রিল তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয় এখানে ৩৪ জনের ভিতর ৩৩ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের আর ১ জন ছিলেন ন্যাপের (সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত) এই কমিটিতে একজন মহিলাও (বেগম রাজিয়া বানু) ছিলেন। এই কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। ১৯ এপ্রিল প্রথম গণপরিষদের আহবান করা হয় এবং কমিটি এখানে ৪৭ অধিবেশনে ৩০০ ঘণ্টা সময় ব্যয়ে খসড়া করে এবং ১০ জুন তা চূড়ান্ত করেন। এর মধ্যে অভিজ্ঞ লোকেরা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে তাদের নিজ নিজ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। সংবিধান রচনা কমিটি ভারত ও যুক্তরাজ্যের সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেন। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর কমিটির শেষ বৈঠকে খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর ২য় অধিবেশন ডাকা হয় এবং সেইদিন তা ড. কামাল হোসেন উত্থাপন করেন এবং ১৯ অক্টোবর প্রথম পাঠ হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২য় পাঠ হতে থাকে। এতে ১০টি বৈঠকে মোট ৩২ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। এভাবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত তা চলতে থাকে। অবশেষে ৪ নভেম্বর সংবিধানের সর্বশেষ পাঠ হয়। বিপুল আনন্দের মধ্য দিয়ে পাঠ শেষে তা সংবিধানরূপে গণপরিষদের কার্যকর হয়। এজন্য ৪ নভেম্বর ‘সংবিধান দিবস’ হিসাবে পালিত হয়। হস্তলিখিত সংবিধানটির মূল লেখক ছিলেন আব্দুর রউফ। হস্তলিখিত সংবিধানটির অঙ্গসজ্জা করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা মূলতবী ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর তা হস্তলিপির সংস্করণে গণপরিষদের সদস্যদের স্বাক্ষর গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর তা কার্যকর করা হয়। এ সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ, ৮২টি পৃষ্ঠা এবং ৪টি তফসিল রয়েছে। ১৯৭২ সালের পর এ পর্যন্ত সংবিধানে মোট ১৫টি সংশোধনী আনা হয়েছে। এরই মধ্যে মোট ৬টি সংশোধনী (৫ম-১০ম) সামরিক অফিসারদের মাধ্যমে হয়েছে।

এখানে বিবেচ্য যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২২ মার্চ ‘বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ’ আইন জারি করা হয়। এই আইন বলে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত তৎকালীন ‘পূর্ব পাকিস্তান’ অংশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। আরো স্পষ্ট করে বললে, পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে ‘পূর্ব পাকিস্তানের’ স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য যারা ইয়াহিয়া খানের এল এফ ও বা আইনগত কাঠামোর আওতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। ঐ নির্বাচনদ্বয়ে মোট সদস্য সংখ্যা ৪৬৯ জন (জাতীয় পরিষদের আসন ১৬৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের আসন ৩০০টি)। তবে ৪৩০ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ যাত্রা শুরু করে এবং শেষ অর্ধেক টিকে থাকেন ৪০৩ জন। মৃত্যু, পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বহিষ্কার, দল থেকে বহিষ্কার ইত্যাদি নানা কারণে মোট ৪৬৯ জন সদস্যের মধ্য থেকে সর্বমোট ৬৬ জন সদস্যের সংবিধান প্রণয়নে অংশ ছিল না। এ হিসেবে ১ কোটিরও বেশি দেশবাসীর সংবিধানে প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

এবং যারা সংবিধান রচনা করেছিলেন তাদের সেই সংবিধান রচনা করার অধিকারও ছিলো না। মানুষ ভোট দিয়েছিলো স্বায়ত্তশাসনের অধীনে সংবিধান রচনা করার জন্যে। একটি স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনা করার অধিকার দেয় না। বাংলাদেশের গণপরিষদের অন্যতম একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ছিল না। ২২ মার্চ, ১৯৭২ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা গণপরিষদ সদস্য (সদস্য বাতিল) আদেশ আইন বলে গণপরিষদ সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের পথ রুদ্ধ করা হয়। ন্যাপ থেকে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এ কমিটিতে একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন।

বাংলাদেশের গণপরিষদের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এই গণপরিষদের কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না। মন্ত্রীসভার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ছিল না সরকারের ওপর তদারকির ক্ষমতা। অর্থাৎ একটি নিয়ন্ত্রিত সংবিধান সভা বা গণপরিষদ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন করেছে। এ সময় অধ্যাদেশ জারি করে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর ইচ্ছাই ছিল আইনের উৎস। ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতা অত্যন্ত সুকৌশলে বলবত রাখা হয়েছে। বস্তুত এক ব্যক্তির ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার লক্ষ্য নিয়ে এই সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১. সংক্ষিপ্ত : বাংলাদেশের সংবিধান একটি সংক্ষিপ্ত সংবিধান। এ ধরনের সংক্ষিপ্ত সংবিধান পৃথিবীর অনেক জায়গায় দেখা যায় না। এ সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ, ৮২টি পৃষ্ঠা এবং ৪টি তফসিল আছে।

২. লিখিত সংবিধান : এ সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। এ সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ, ৮২টি পৃষ্ঠা এবং ৪টি তফসিল আছে। এখানে বলা হয়েছে যে, এ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হল বাংলা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আমার সোনার বাংলা”র প্রথম দশটি চরণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় পতাকার রং সবুজ ক্ষেত্রের উপর লাল বৃত্ত। জাতীয় প্রতীক হল উভয় পার্শ্বে ধান্যশীষবেষ্টিত পানিতে ভাসমান শাপলা ফুল, শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্ত পাতা আর উভয় পাশে দুটি তারকা। বাংলাদেশের রাজধানী হল ঢাকা।

৩. এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা : এখানে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে যার নাম হল “জাতীয় সংসদ”। ১৯৭২ সালের সংবিধানে মোট ৩১৫টি সংসদ সদস্যদের জন্য আসন বরাদ্দ ছিল যার ভিতর ৩০০টি সাধারণ আর ১৫টি ছিল সংরক্ষিত আসন। বর্তমানে এর সংখ্যা ৩৫০ করা হয়েছে অর্থাৎ, নারী আসনের সংখ্যা ১৫ থেকে ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে।

৪. মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা : আমাদের সংবিধানের ৩য় বিভাগে এই বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এর মধ্যে চিন্তা করা, মতামত প্রকাশ, ধর্ম-কর্ম করা, চলা-ফেরা করা, বাক-স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি বিষয়াবলী বর্ণিত হয়েছে। তবে এসকল অধিকাংশ অধিকারের উপর সংসদ বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে।

৫. জনগণের সার্বভৌমত্ব : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে যে ‘সকল ক্ষমতার উৎস হল জনগণ’। এ দেশের সরকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এ দেশের সরকারের ভবিষ্যৎ জনগণের উপর নির্ভরশীল।

৬. সার্বজনীন ভোটাধিকার : এখানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক ব্যক্তি এক ভোট এই নীতি হল বাংলাদেশের সার্বজনীন ভোটাধিকারে মূলভিত্তি। আঠারো বছরের অধিক বয়সের নাগরিকগণ এখানে জাতীয় যেকোন বিষয়ে ভোট দিতে পারবে।

৭. মানবাধিকার সমুন্নত রাখা : সংবিধানে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মানুষকে যেন অন্যায়ভাবে হত্যা না করা হয়, কারও সম্পদ যেন লুণ্ঠন করা না হয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৮. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল : সাধারণ বিচার বিভাগ ছাড়াও এখানে এক ধরনের বিশেষ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আছে যেখানে প্রশাসনের সকল উর্ধ্বতন, অধঃস্তন কর্মকর্তা, কর্মচারীদের চাকুরীর বদলি পদোন্নতি, বরখাস্ত ইত্যাদি বিষয়ে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের হস্তক্ষেপ থাকবে। এ ধরনের ট্রাইব্যুনাল ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ অনেক দেশেই নেই।

৯. জেলা প্রশাসন : সংবিধানে জেলা প্রশাসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনকে শাসনের মধ্যমণি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য মনোনীত হন।

১০. সুপ্রীম কোর্টের ব্যবস্থা : সংবিধানে এই সুপ্রীম কোর্ট কাউন্সিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জিয়াউর রহমানের সময় তা কেবলমাত্র কাউন্সিল করা হয়। এখানে প্রধান বিচারপতি আর অন্যান্য দুই জন সিনিয়র বিচারপতি নিয়ে গঠিত হবে যা বিচারকদের আচরণ বিধি নির্ধারণ করবে।

১১. জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান : ৩য় সংশোধনীর মাধ্যমে তা করা হয়। রাষ্ট্রপতি যদি কোন অবস্থায় দেখতে পান যে, দেশে বিচ্ছিন্নতা অবস্থা বিরাজমান তখন রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবেন।

১২. প্রজাতন্ত্র : বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ। রাষ্ট্রপতি হবেন দেশের সর্বাধিনায়ক এবং তিনি নামে মাত্র দেশ পরিচালনা করবেন। তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন।

১২. সংসদীয় কার্যক্রম : বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্র এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীপরিষদ সকলে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ সংসদ হল সকল প্রকারের শাসনের মূলভিত্তি।

১৩. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি : এটি সংবিধানের ২য় বিভাগে বর্ণিত হয়েছে। এখানে রাষ্ট্র পরিচালনা মূলনীতি হিসেবে চারটি উপাদানকে সনাক্ত করা হয়েছে যা হল- জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। একটি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এসকল মূলনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সংবিধান ও ইসলাম

বাংলাদেশ সংবিধানের ১নং ধারায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। এসব ধারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ যে বিশ্বজাহানের ওপর সার্বভৌম তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটি কুরআনে অনেকবার বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে “আল্লাহই দুনিয়া ও আসমানের সব কিছুর মালিক (সুরা বাকারা :২৫৫)।” সুরা নাসে বলা হয়েছে, মানবজাতির শাসক। অন্যত্র আল্লাহকে বলা হয়েছে, রাজত্বের মালিক। এ কারণেই বিশ্বের প্রায় সব ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। পাকিস্তান ও ইরানের সংবিধানে তা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বলা হয়েছে বা আইনের প্রধান উৎস ইসলামী শরীয়াহ বলা হয়েছে। এ সবই প্রকরান্তরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা বলা। কোনো মুসলিমই আল্লাহর ‘সার্বভৌমত্ব’ (Sovereignty) অস্বীকার করতে পারে না।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়েছে তাতে রাষ্ট্রের মৌলিক চার নীতির মধ্যে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’কে স্থান দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং অনুচ্ছেদ ১২নং অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি হল আমাদের সংবিধান এবং রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(২)নং অনুযায়ী সাংবিধানিক আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। সংবিধান হল বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। আর তাই সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইন কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত হলেও বাংলাদেশের আইন হতে পারবে না। এই এক ধারার মাধ্যমেই কুরআনের আহকামের প্রায় ৫০০ আয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে অন্য যে ধারাগুলো আছে তাতে সরাসরি ইসলামকে আঘাত করা হয় নি। তা সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না এমনকি তাতে ইসলামের কোন উপকারও হচ্ছে না।

ইসলামের প্রধানতম বিষয় হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। মানুষের ওপরে, সমাজের ওপরে, আইন-কানুনসহ মানুষের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেই ইসলামের আগমন হয়েছিলো। যদি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা হয় তাহলে এই এক বাক্যের মাধ্যমেই ইসলামকে অস্বীকার করে দেয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে এই কাজটাই করা হয়েছে এবং সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজন করেও ইসলামকে অস্বীকার করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭ এর ২নং ধারায় পরিষ্কার করে ইসলামী শরীয়াকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এক নজরে সংবিধান : ধারাসমূহ

প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র

১. প্রজাতন্ত্র ২. প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা ২(ক). রাষ্ট্রধর্ম ৩. রাষ্ট্রভাষা ৪. জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক ৪(ক). জাতির পিতার প্রতিকৃতি ৫. রাজধানী ৬. নাগরিকত্ব ৭. সংবিধানের প্রাধান্য ৭(ক). সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ ৭(খ). সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৮. মূলনীতিসমূহ ৯. জাতীয়তাবাদ ১০. সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি ১১. গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ১২. ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ১৩. মালিকানার নীতি ১৪. কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি ১৫. মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ১৬. গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব ১৭. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৮. জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা ১৮(ক). পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ১৯. সুযোগের সমতা ২০. অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম ২১. নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য ২২. নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ২৩. জাতীয় সংস্কৃতি ২৩(ক). উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ২৪. জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন, প্রভৃতি ২৫. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন।

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার

২৬. মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল ২৭. আইনের দৃষ্টিতে সমতা ২৮. ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য ২৯. সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা ৩০. বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ ৩১. আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার ৩২. জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকাররক্ষণ ৩৩. গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ ৩৪. জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ ৩৫. বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ ৩৬. চলাফেরার স্বাধীনতা ৩৭. সমাবেশের স্বাধীনতা ৩৮. সংগঠনের স্বাধীনতা ৩৯. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা ৪০. পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা ৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা ৪২. সম্পত্তির অধিকার ৪৩. গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ ৪৪. মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ ৪৫. শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন ৪৬. দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা ৪৭. কতিপয় আইনের হেফাজত ৪৭(ক). সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা।

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রপতি

৪৮. রাষ্ট্রপতি ৪৯. ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার ৫০. রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ ৫১. রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি ৫২. রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ৫৩. অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ ৫৪. অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতির পদে স্পীকার।

২য় পরিচ্ছেদ : প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা

৫৫. মন্ত্রীসভা ৫৬. মন্ত্রীগণ ৫৭. প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ ৫৮. অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ ৫৮(ক). [বিলুপ্ত]

২ক পরিচ্ছেদ

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার [সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত।] [বিলুপ্ত]

৩য় পরিচ্ছেদ : স্থানীয় শাসন

৫৯. স্থানীয় শাসন ৬০. স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

৪র্থ পরিচ্ছেদ : প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

৬১. সর্বাধিনায়কতা ৬২. প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি ৬৩. যুদ্ধ

৫ম পরিচ্ছেদ : অ্যাটার্নি -জেনারেল

৬৪. অ্যাটর্নি-জেনারেল

পঞ্চম ভাগ : আইনসভা

১ম পরিচ্ছেদ : সংসদ

৬৫. সংসদ-প্রতিষ্ঠা ৬৬. সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ৬৭. সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া ৬৮. সংসদ-সদস্যদের [পারিশ্রমিক] প্রভৃতি ৬৯. শপথ গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড ৭০. রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া ৭১. দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা ৭২. সংসদের অধিবেশন ৭৩. সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী ৭৩(ক). সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার ৭৪. স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার ৭৫. কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি ৭৬. সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ ৭৭. ন্যায়পাল ৭৮. সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি ৭৯.

সংসদ-সচিবালয়

২য় পরিচ্ছেদ : আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি

৮০. আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ৮১. অর্থবিল ৮২. আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ ৮৩. সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা ৮৪. সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব ৮৫. সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ ৮৬. প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে প্রদেয় অর্থ ৮৭. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি ৮৮. সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় ৮৯. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি ৯০. নির্দিষ্টকরণ আইন ৯১. সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী ৯২. হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট ৯২(ক). [বিলুপ্ত]

৩য় পরিচ্ছেদ : অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা

৯৩. অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা

ষষ্ঠ ভাগ : বিচারবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ : সুপ্রীম কোর্ট

৯৪. সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা ৯৫. বিচারক-নিয়োগ ৯৬. বিচারকের পদের মেয়াদ ৯৭. অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ৯৮. সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ ৯৯. অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা ১০০. সুপ্রীম কোর্টের আসন ১০১. হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার ১০২. কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ১০৩. আপীল বিভাগের এখতিয়ার ১০৪. আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারি ও নির্বাহ ১০৫. আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা ১০৬. সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার ১০৭. সুপ্রীম কোর্টের বিধি-প্রণয়ন-ক্ষমতা ১০৮. “কোর্ট অব রেকর্ড” রূপে সুপ্রীম কোর্ট ১০৯. আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ১১০. অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর ১১১. সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা ১১২. সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা ১১৩. সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ

২য় পরিচ্ছেদ : অধস্তন আদালত

১১৪. অধস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা ১১৫. অধস্তন আদালতে নিয়োগ ১১৬. অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা ১১৬(ক). বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ

বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন ।

৩য় পরিচ্ছেদ : প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১১৭. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ

ষষ্ঠ ক ভাগ-জাতীয়দল

[সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪১ ধারাবলে বিলুপ্ত।] [বিলুপ্ত]

সপ্তম ভাগ : নির্বাচন

১১৮. নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা ১১৯. নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ১২০. নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ ১২১. প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা ১২২. ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা ১২৩. নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ১২৪. নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ১২৫. নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা ১২৬. নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা দান

অষ্টম ভাগ : মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১২৭. মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা ১২৮. মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব ১২৯. মহা হিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ ১৩০. অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক ১৩১. প্রজাতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি ১৩২. সংসদে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন

নবম ভাগ : বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ : কর্মবিভাগ

১৩৩. নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী ১৩৪. কর্মের মেয়াদ ১৩৫. অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি ১৩৬. কর্মবিভাগ পুনর্গঠন

২য় পরিচ্ছেদ : সরকারী কর্ম কমিশন

১৩৭. কমিশন-প্রতিষ্ঠা ১৩৮. সদস্য নিয়োগ ১৩৯. পদের মেয়াদ ১৪০. কমিশনের দায়িত্ব ১৪১. বার্ষিক রিপোর্ট

নবম-ক ভাগ : জরুরি বিধানাবলী

১৪১(ক). জরুরি অবস্থা ঘোষণা ১৪১(খ). জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ ১৪১(গ). জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণ

দশম ভাগ : সংবিধান সংশোধন

১৪২. সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

একাদশ ভাগ : বিবিধ

১৪৩. প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ১৪৪. সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি-প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব ১৪৫. চুক্তি ও দলিল ১৪৫(ক). আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৪৬. বাংলাদেশের নামে মামলা ১৪৭. কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি ১৪৮. পদের শপথ ১৪৯. প্রচলিত আইনের হেফাজত ১৫০. ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী ১৫১. রহিতকরণ ১৫২. ব্যাখ্যা ১৫৩. প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ।

বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনসমূহ

সংবিধান গৃহীত হওয়ার মাত্র ৭ মাসের মাথায় প্রথম সংশোধনী করা হয়। তারপর এ পর্যন্ত ১৬ বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে যেসব সংশোধনী রাষ্ট্রের চরিত্রে প্রভাব ফেলেছে বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধে আঘাত করেছে সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

২য় সংশোধনী

১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর ফলে সরকার মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন তৈরি ও জারি করার অধিকার লাভ করে। নিবর্তনমূলক আটকাদেশের বিধান, জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে মৌলিক অধিকার স্থগিত করার বিধান এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজন করা হয়। বস্তুত মূল সংবিধানে নাগরিকদের যতটুকু মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল, এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র তা থেকে সুস্পষ্টভাবে ফিরে আসে।

৪র্থ সংশোধনী

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের বদলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। মৌলিক অধিকার বলবৎ করণের জন্য হাইকোর্টের পরিবর্তে সাংবিধানিক আদালত বা কমিশন রাখার বিধান করা হয়। হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা দেশ শাসনের যে বিধান ছিল তা বাতিল করা হয়। অনুচ্ছেদ ৭০ কে আরও পোক্ত করা হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল চালু করার বিধান যুক্ত করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তা হন রাষ্ট্রপতি এবং তিনি তাঁর নির্বাহী কর্তৃত্বে অধীনস্থ কর্মচারীদের (আমলাদের) দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনার অধিকারী হন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদ্বারা দেশ শাসনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণ রূপে ভুলুপ্তি করা হয়। এভাবে এ সংশোধনী রাষ্ট্রটাকে পুরোপুরি স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করে।

৫ম সংশোধনী

১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর বলে সকল সামরিক ফরমানের বৈধতা দেয়া হয়। বস্তুত এ সংশোধনী হল সামরিক শাসন বৈধতা ও দায়মুক্তির সংশোধনী। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রটাকে প্রধানত সমরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়।

দ্বাদশ সংশোধনী

১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর দ্বারা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা ফেরত আনা হয়। আবারো প্রধানমন্ত্রীকে সকল ক্ষমতার মালিক বানানো হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের দিকে ফেরত যাত্রা শুরু হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনী

২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর বলে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনা ফেরত আনা হয়েছে, নাগরিকের বাঙালিত্ব ফেরত এসেছে। সংবিধানের মূলনীতি অংশের অনুচ্ছেদ ৮-এর জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ৭২-এর চেহারা ফেরত এসেছে। অনুচ্ছেদ ৭০ ফেরত এসেছে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুসারে। মূল সংবিধানে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনের যে বিধান ছিল তা-ই নতুনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মৌলিক অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩৮, যেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সংগঠন করার ওপর বিধিনিষেধ ছিল, তা ফেরত এসেছে নতুন আঙ্গিকে। নতুন যুক্ত হয়েছে ১৮-ক এবং ২৩ক। ১৮ক তে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে এবং ২৩ক তে উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল অবৈধ ক্ষমতা দখল রোধ করতে গিয়ে সংবিধানে এমন বিধান যুক্ত করা হয়েছে যাতে সংবিধানের সমালোচনাকে রাষ্ট্রদোহীতার শামিল করা হয়েছে। আরও ভয়ংকর ব্যাপার হল সংবিধানের প্রস্তাবনা, মূলনীতিসহ বেশ কিছু অনুচ্ছেদকে অমরত্ব প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলো কখনই পরিবর্তন করা যাবে না যা গণতন্ত্রসম্মত নয়।

এসব সংশোধনীর বলে রাষ্ট্র অধিকতর ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণকারী মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের অধিকার পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তথা এক ব্যক্তির ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করা হয়েছে। ৫ম ও ৭ম সংশোধনী দ্বারা সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে।

ষোড়শ সংশোধনী

সর্বশেষ ষোড়শ সংশোধনী দ্বারা বিচারপতিদের অভিশংসন ক্ষমতা ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের অনুরূপ জাতীয় সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের ৪৩ বছরের ইতিহাসে সংবিধান বিষয়ক আলোচনা-পর্যালোচনাকে মোটা দাগে ৩ টি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব সংবিধান রচনাকাল। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই সংবিধানের বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহমেদ সর্বদলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আর একটি সাধারণ নির্বাচন না করে দেশের জন্য স্থায়ী সংবিধান গ্রহণ করা যেতে পারে না। তবে এসব পরামর্শ কোন রকম বিবেচনায় না নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তান অংশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে সংবিধান সভা বা গণপরিষদ গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ইয়াহিয়া খানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ম্যানডেট নিয়ে বিজয়ী হওয়া ব্যক্তিদের বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি দাবী করেন এই সদস্যদের বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের কোন অধিকার নেই। তখনকার সাবেক ছাত্র নেতা

আ.স.ম. রব ও শাহজাহান সিরাজ দাবী করেন, পরিষদ সদস্যদের শতকরা নব্বই জনই স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছিল না। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত একটি স্বাধীন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার তাদের থাকতে পারে না। বিরোধীদের প্রধান যুক্তি ছিল, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গোটা জাতির রাজনৈতিক চেতনার যে বিকাশ ঘটেছে তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই নতুন নির্বাচনের প্রয়োজন যা ৭০ সালের পরিষদ সদস্যরা ধারণ করতে পারে না।

গণপরিষদে খসড়া উত্থাপনের পর বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবী তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এদের মধ্যে সিপিবি সংবিধানকে সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক অভিহিত করে স্বাগত জানায়। যদিও তারা স্বীকার করে এতে কিছু ত্রুটি আছে যা সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। ন্যাপ মোজাফফর সংবিধানের বেশ কিছু ধারাকে সমালোচনা করে বলে, শাসনতন্ত্রের মূল অনুচ্ছেদে কেবলমাত্র কতগুলো সদিস্কার ঘোষণা দেয়া হয়েছে যা পূরণে রাষ্ট্র আইনানুগভাবে বাধ্য নহে। লেনিনবাদি পার্টি মনে করে এই সংবিধান সমাজতান্ত্রিক তো নয়ই, এমনকি অন্যান্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের যে ধরনের সাংবিধানিক অধিকার থাকে তা ও নেই। বিরোধী গণপরিষদ সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, যেসব ধারার নিন্দা আওয়ামীলীগ ৫৬ সালে করেছিল, হুবহু সেগুলোই তারা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে প্রবিষ্ট করিয়েছে। আরেক বিরোধী গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন, শাসনতন্ত্র বিলের প্রতিটি প্রমাণ দেয় যে, এক হাতে জনগণকে অধিকার দেয়া হয়েছে, অন্য হাতে সে অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। বদরুদ্দিন উমর এটিকে চিরস্থায়ী জরুরি অবস্থার একটি সংবিধান অভিহিত করে বলেন, শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে অসীম ক্ষমতা চর্চার অধিকার দেয়া হয়েছে।

সামরিক স্বৈরতন্ত্র তথা সমরতন্ত্রের প্রতিভু এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে সরকার ব্যবস্থা ও সংবিধান নিয়ে নতুন করে আলোচনা-সমালোচনা এবং তর্কবিতর্কের সূচনা হয়। মূলত আশির দশকের শেষ দিক থেকে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পর্যন্ত সময়কালকে সংবিধান নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার দ্বিতীয়পর্ব বলা যেতে পারে। এ সময়ের তর্কবিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল সরকার পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে। এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনরত তিন জোটের রূপরেখা অনুসরণ করে এ ধারা সংবিধানের সকল অগণতান্ত্রিক বিধি-বিধান আড়াল করে শুধুমাত্র চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা বাতিলকৃত মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা পুনঃবহালকে গণতন্ত্রের সমর্থক করে আলোচনার কেন্দ্রবিদ্যুতে পরিণত করে। যেন মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা মাত্রই গণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা মাত্রই অগণতান্ত্রিক। যেন মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা গেলে আপনা আপনিই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। একইসাথে এ ধারা ‘সার্বভৌম সংসদ’ নামক গণতন্ত্র বিরোধী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ এ ধারার বিশেষজ্ঞ প্রতিভু হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

এ সময়কালে সংবিধান বিষয়ক আলোচনার আর একটি ধারা বিকাশ লাভ করেছিল। এ ধারা ৭২-এর মূল সংবিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালাচ্ছিল। প্রধানত

বাম ঘরানার বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদগণ এ ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মধ্যবিত্তের ওপর বা রাজনীতি সচেতন জনগণের ওপর এ ধারা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এ ধারা মতে ৭২-এর মূল সংবিধান মূলত গণতান্ত্রিক এবং মূল সংবিধানই বিদ্যমান সাংবিধানিক রাজনৈতিক সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারে। দল হিসেবে সিপিবি এ ধারার নেতৃত্ব প্রদান করে।

৭২-এর মূল সংবিধানকে অগণতান্ত্রিক অভিহিত করে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নকে প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য মনে করার একটি ক্ষুদ্র ধারাও বিরাজ করছিল এসময়। দল হিসেবে ঐক্য প্রক্রিয়া এ ধারাকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিল। ঐক্য প্রক্রিয়ার কর্মসূচিতে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ফরহাদ মাজহার গণতান্ত্রিক রপ্তা ও গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে বিভিন্ন নিবন্ধ লিখে প্রচুর বিতর্কের সূত্রপাত ঘটান। এ সময়কালে সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান, এ. বি. এম. মুসা, আইনজ্ঞ শাহদিন মালিকসহ অনেকেই সংবিধানের বিভিন্ন বিধি নিয়ে পর্যালোচনামূলক বক্তব্য হাজির করেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী নিয়ে আর একটি ধারাও এসময় ক্রিয়াশীল ছিল। প্রধানত ইসলামি চিন্তাবিদ ও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো এ ধারার প্রবর্তক। কোরআন ও সুন্নাহ ইসলামী শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হলেও দলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। এবং এদের বড় অংশই বিএনপি-এর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে রাজনীতি করছে।

নতুন করে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের নামে এক ব্যক্তি তথা প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থা পুণঃপ্রবর্তনের পর বিভিন্ন ইস্যুতে আরও কয়েকবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। প্রতিটি সংশোধন কালেই মূলত সংসদের বাহিরে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আলোচনাগুলোর অনেকটাতে সংবিধানের মর্ম বা গভীরে যেতে দেখা যায়। অর্থাৎ এ সময়কালটাতে সংবিধানের প্রকৃত পর্যালোচনার ব্যাপ্তি বেড়েছে বলা যায়। তাই দ্বাদশ সংশোধনীর পর থেকে আজ পর্যন্ত সময়কালটাকে সংবিধান বিষয়ক আলোচনার ৩য় পর্ব বলা অত্যুক্তি হবে না। এ সময়কালে মিজানুর রহমান খান নিজেকে একজন সংবিধান পর্যালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সাংবাদিক নুরুল কবির, আইনজ্ঞ শাহদিন মালিকসহ আরও অনেকেই সংবিধানের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক বিধি নিয়ে সরব রয়েছেন।

বরাবরের মত এ সময়কালটাতেও বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক বিধি সম্বলিত বিদ্যমান সংবিধানের স্বপক্ষ রাজনৈতিক ধারা এদেশের প্রধান ধারা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের প্রভাবিত করে আছে। ক্ষমতাসীন দল ও জোট এবং প্রধান বিরোধী দল ও জোট এ ধারারই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অংশ। এদের মধ্যে কয়েকটি ইস্যু যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ইত্যাদি প্রশ্নে বিরোধ থাকলেও সংবিধানের অগণতান্ত্রিক বিধি বিধান প্রশ্নে কোন বিরোধ দেখা যায়নি। এ পর্বে শাসক শ্রেণির রাজনীতিবিদদের একাংশের সংবিধানের কোন কোন অগণতান্ত্রিক বিধি বিধানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর অপরিসীম ক্ষমতা কমানোর পক্ষপাতি এরা। ৭২-এর মূল সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন কর্তৃক সংবিধানের ৭০ ধারা বাতিলের দাবি খুবই প্রণিধানযোগ্য। এটা এ ইঙ্গিতও

দিচ্ছে সংবিধানের গণতন্ত্রায়নের দাবীটি শাসক শ্রেণির ভাবনাতেও চলে এসেছে।

৭২-এর মূল সংবিধান মূলত গণতান্ত্রিক এবং মূল সংবিধানই বিদ্যমান সাংবিধানিক রাজনৈতিক সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারে এখনো এই বিশ্বাস প্রগতিশীল চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করে আছে। সিপিবি এখনো এ ধারারই নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। কামাল লোহানীর নেতৃত্বে এ সময়কালে ৭২-এর মূল সংবিধান পুনরুদ্ধার কমিটি গঠিত হয়।

তবে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের ধারাটি আরও শক্তিশালী হয়েছে। দল হিসেবে গণসংহতি আন্দোলন এ ধারাকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট। গণতান্ত্রিক আইন ও সংবিধান আন্দোলন এ প্রশ্নে তাত্ত্বিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। আরও ছোট ছোট দল ও সংগঠন গণতান্ত্রিক সংবিধানের দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছে।

১৬ বার সংশোধিত বিদ্যমান সংবিধান অগণতান্ত্রিক বিধি-বিধান দ্বারা যুক্ত তা আজ রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেকটা স্বীকৃত। শাসক শ্রেণির একাংশও কিছু অগণতান্ত্রিক বিধি-বিধানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। ফলত সংবিধানের গণতন্ত্রায়নের দাবীটি নতুন মাত্রা পাচ্ছে। এখন যে প্রশ্নটি সামনে উঠে আসছে তা হল সংবিধানের গণতন্ত্রায়নে সংবিধানের কিছু বিধি-বিধান সংশোধন ও সংযোজন করলেই চলবে, নাকি নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। সাথে সাথে কোন প্রক্রিয়ায় সংবিধান সংশোধন বা প্রণয়ন করা হবে সে প্রশ্নেরও মীমাংসা করতে হবে।

এ নিবন্ধে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রশ্নে আমাদের দেশে দু'টি ধারা ক্রিয়াশীল রয়েছে। প্রধান ধারা সংশোধনপূর্ব ৭২-এর মূল সংবিধানকে মূলত গণতান্ত্রিক মনে করে এবং বিশ্বাস করে মূল সংবিধানই বিদ্যমান সাংবিধানিক রাজনৈতিক সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারে। দ্বিতীয় ধারা ৭২-এর মূল সংবিধানকে অগণতান্ত্রিক মনে করে এবং নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নকে প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য মনে করেছে। গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রশ্নে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে প্রথমে এ বিষয়টা মীমাংসা হতে হবে। আজকের বাংলাদেশের এ চেহারা বা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার বীজ সংশোধনপূর্ব ৭২-এর মূল সংবিধানে প্রোথিত ছিল কি না তার পর্যালোচনা আগে সারতে হবে। এটা হবে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একধাপ অগ্রগতি।

৭২-এর মূল সংবিধান গণতান্ত্রিক কি না, কিংবা এর কোন কোন ধারা বা বিধি-বিধান অগণতান্ত্রিক সে আলোচনায় যাওয়ার আগে যে বিষয়টা স্মরণ করাতে চাই তা হল মূল সংবিধানের দেয়া ক্ষমতা বলেই এসব সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। এমনকি সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলেও এ সংবিধান বাঁধা হয়ে দাঁড়াইনি। সংবিধান প্রণয়নের দেড় বছরের মাথায় বাংলাদেশ আমলা নির্ভর স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হল কেন এ পর্যালোচনা আজ খুবই জরুরি।

৭২-এর মূল সংবিধান সম্পর্কিত দ্বিতীয় যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে তা হল- ঔপনিবেশিক আমলের সকল আইন কানুন এ সংবিধানে বহাল রাখা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৪৯, ১৫২ ধারা বলে স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত আইন এদেশে জারি ছিল, কার্যক্ষেত্রে তা সক্রিয় থাকুক আর না থাকুক, সে সবই স্বাধীন

দেশের আইন হিসেবে বহাল রয়েছে। যেসব আইন ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল তাদের ঔপনিবেশিক শাসন নিরঙ্কুশ করা, অর্থনৈতিক লুণ্ঠন আর আন্দোলনকারীদের দমন-পীড়নের জন্য; যা অব্যাহত রেখেছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একই উদ্দেশ্যে; বাংলাদেশেও সেগুলো হুবহু কার্যকর করা হয়েছে। যা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মূলমন্ত্র, যে আকাজক্ষায় দেশের মানুষ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যে সমাজ গড়বে বলে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছে, সে আকাজক্ষাগুলো সংবিধানের প্রস্তাবনায়, মূলনীতিতে লেখা হয়নি। কার্যক্ষেত্রে এসে ঔপনিবেশিক আমলের সকল অগণতান্ত্রিক আইন কানুন বহাল রেখে এবং সেই সাথে নতুন কিছু অগণতান্ত্রিক আইন যুক্ত করে পাকিস্তান রাষ্ট্রটাই স্বাধীন দেশে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৭২-এর মূল সংবিধানের ৪৬, ৭০, ১৪২ ও ১৪৯ ধারাগুলো প্রধানত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিকতার উৎস হিসেবে বেশি করে চিহ্নিত। তবে আরও কিছু ধারায়ও অগণতান্ত্রিকতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ১৪২ ধারা বলে সংসদ সদস্যরা সংবিধানের যে কোন ধারা-উপধারা, বিধিবিধান বাতিল বা সংশোধন করতে পারে। তবে এ জন্য দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন পরবে। কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংসদের সংবিধান বদলের এমন অধিকার নেই। সংবিধান প্রণয়ন হয় সংবিধান সভায়। রাষ্ট্র কি ভাবে আইন প্রণয়ন করবে তার নিয়ম, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের চরিত্র ও আন্তঃসম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারণ, নাগরিকের মৌলিক অধিকার কীভাবে রক্ষিত হবে প্রভৃতি অতি মৌলিক ও ভিত্তিমূলের বিষয়গুলো হল সংবিধানের বিষয় যা সংবিধান সভা নির্ধারণ করে। প্রণীত সংবিধানের আলোকে সংসদ আইন প্রণয়ন করে থাকে। অর্থাৎ আইন প্রণয়ন করার আইন হচ্ছে সংবিধান। তবে সংবিধানের আলোকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংসদের থাকলেও এমন কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না যা ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব ও মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে। একবার সংবিধান সভার মাধ্যমে সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর সংবিধানের ছোটখাট পরিবর্তনে রেফারেনডাম এবং মৌলিক পরিবর্তনে নতুন করে সংবিধান সভা ডাকতে হয়। কারণ, জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন নিশ্চিত না করে সংবিধান বদলের কোন অধিকার কারও থাকতে পারে না। তাছাড়া যে সংবিধানের ভিত্তিতে সংসদ ডাকা হয় সেই ভিত্তিটা বদলে দেবার ক্ষমতা সংসদের থাকে না। এটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ৭২-এর মূল সংবিধানের ১৪২ ধারা বলে সংসদকে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করার অধিকার দেয়া হয়েছে, যেমন খুশি তেমন আইন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। সংবিধানের বিশাল একটা অংশ জুড়ে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বড় বড় কথা বলা হল, মৌলিক অধিকার বিরোধী আইন প্রণয়ন করা যাবে না কায়দা করে লেখা হল। অথচ এরপর বলা হল সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য চাইলে সব কিছুই করা যাবে। এ এক অদ্ভুত প্রতারণা। এত বড় অগণতান্ত্রিক বিধান থাকার পরও ৭২-এর মূল সংবিধানকে গণতান্ত্রিক বলা যায় কি?

মূল সংবিধানের ৭০ নং ধারায় দলীয় সংসদ সদস্যদের অধিকার ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করেছে। এ ধারার কারণে কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনীত

হয়ে কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন বা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে। এ ধারা বলে সংসদ সদস্যরা দলের বিরুদ্ধে ভোটতো দিতে পারবেনই না; এমনকি ভোটভোটির সময় সংসদে অনুপস্থিত থাকলেও বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হবে। অর্থাৎ, সংসদে সংসদ সদস্যরা কলাগাছ হিসেবে থাকবেন এবং দল যা বলবে সে অনুযায়ী তিনি হ্যাঁ বা না বলবেন। এ ধারাটি গণপরিষদ গঠনকালে ২২ মার্চ, ১৯৭২ র‍াষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশ এর অনুরূপ। আদেশটি হল, যদি কোন গণপরিষদ সদস্য তিনি যে দলের মনোনয়নে নির্বাচিত হয়েছেন সে দল থেকে পদত্যাগ করেন বা দল তাকে বহিস্কার করে তবে তার সদস্যপদ বিলুপ্ত হবে এবং এ বিষয়ে আদালত-এ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। এ আদেশের মাধ্যমে আওয়ামীলীগ তার নিজের আয়ত্তে থাকা গণপরিষদের কাছ থেকে তার স্বাভাবিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে গণপরিষদকে প্রধানমন্ত্রীর আজ্ঞাবহ গণপরিষদে পরিণত করে। এটি দলীয় গণপরিষদ সদস্যদের মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছিল। তাই এ আদেশ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক চেতনা বিরোধী আইন। এ আইনটিই সংবিধানসম্মত হয়ে মূল সংবিধানের ৭০ নং ধারায় গৃহীত হয়ে সংসদ সদস্যদের মুখ বন্ধে কাজ করছে। যেভাবে গণপরিষদ সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে বিনষ্ট করা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতা সংসদেও অব্যাহত থাকল। অবশ্য ৭০ নং ধারার স্বপক্ষে যুক্তি রয়েছে তা হল, সংসদ সদস্যদের কেনাবেচা বা সুবিধাবাদিতায় সরকারের অকারণ পতন হয় যা কাম্য হতে পারে না। পাকিস্তান আমলে এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে। দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে এসে সংসদে গিয়ে দল বদল করার মতো সুবিধাবাদ ঠেকানো দরকার, তবে তা সাংসদদের পুতুল বানিয়ে নয়। সংসদ হল বিতর্কের জায়গা। সেই বিতর্কে সাংসদ তার দলকে নয়, বরং যাদের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন তাদের প্রতিনিধিত্ব করার কথা। সে ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাঁর সঙ্গে দলের অন্যান্য সাংসদদের মতবিরোধ থাকতে পারে। এই মতবিরোধ সংসদে প্রকাশ করার অধিকার হরণ করা মানে তিনি যাদের প্রতিনিধি তাদের মৌলিক অধিকার হরণ করা। তাই এ ক্ষেত্রে, সরকারের টিকে থাকার প্রক্ষেপে শুধুমাত্র আস্থা ভোটের বেলায় এ ধারা প্রযোজ্য হতে পারে।

আজকাল হরহামেশাই ক্রসফায়ার, এ্যানকাউন্টারে নিহত হওয়ার গল্প শোনা যায়। বিনা বিচারে বা বিচার বহির্ভূত এসব হত্যার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে কোন রকম জবাবদিহী করতে হয় না বা বিচারের মুখোমুখি হতে হয় না। কেননা, বিনা বিচারে এসব হত্যার আইনগত ভিত্তি আমাদের সংবিধান, ৭২-এর মূল সংবিধানেই বিদ্যমান রয়েছে। মৌলিক অধিকার ভাগের ৪৬ নং অনুচ্ছেদ হল সেই বিধান যেখানে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যদি কোন অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কাজ করে তবে আইনের মাধ্যমে দায়মুক্ত করা যাবে। অর্থাৎ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কাউকে হত্যাও করা হয় তবুও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে অব্যাহতি দিতে আইন প্রণয়ন করা যাবে। এর ফলে মৌলিক অধিকার ভাগে বর্ণিত ‘আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান’ বা ‘সকলেই

আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী’ অথবা কাউকে আইন অনুযায়ী ব্যতীত ‘জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা’ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না বলে যেসব অধিকার নিরঙ্কুশ ভাবা হয়েছিল তা আর নিরঙ্কুশ থাকল না। তেমনি, ‘মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্য আইন বাতিল হয়ে যাবে’ অথবা ‘অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা যাবে না’ বক্তব্যসমূহ মিথ্যা, চাতুরিপূর্ণ ও ঠগবাজিতে পরিণত হয়। মজার ব্যাপার হল, ৪৬ নং অনুচ্ছেদের বক্তব্যটি ঔপনিবেশিক ভারত শাসন আইন থেকে ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদ হুবহু নকল করেছিল। বাংলাদেশের সংবিধানেও সেই ভাষাই আছে, শুধু ‘মার্শাল ল’ কথাটি নাই। ৪৬ নং অনুচ্ছেদটি মৌলিক অধিকার (৩য় ভাগ) অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, যদিও এটি মৌলিক অধিকার রক্ষা নয়, মৌলিক অধিকার হরণ করার বিধান।

সাত.

৭২-এর সংবিধানের ভিত্তিতে বাংলাদেশে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি শাসিত এ দু’ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার সূতিকাগার হল ইংল্যান্ড, দু’শ বছর আমরা যার উপনিবেশ ছিলাম। তাই বোধ হয় আমরা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার সাথে বেশি পরিচিত এবং এ ব্যবস্থায় স্বস্তি অনুভব করি। তবে ইংল্যান্ডের সরকার ব্যবস্থাপ্রণয় করলেও এধরনের সরকার ব্যবস্থার মর্ম বা নির্যাস যেমন ৭২-এর সংবিধানে প্রতিফলিত হয়নি, তেমনি সরকারগুলোকেও তা চর্চায় নিতে চেষ্টা করতে দেখা যায়নি। অর্থাৎ শাসনকার্য পরিচালনায় গণতন্ত্রের মর্মের কোন প্রতিফলন পাওয়া যাবে না। ইংল্যান্ডে রাজা বা রাণী (বর্তমানে রাণী) সাংবিধানিক প্রধান। তাঁকে সমালোচনা করা যায় না, তিনি আদালতেরও উর্ধ্বে। রাণীর নামেই শাসনকার্য পরিচালনা, আইন প্রণয়ন ও বিচারকার্য পরিচালিত হয়। অর্থাৎ রাণী একই সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের অংশ ও প্রধান। এভাবে তাঁর ব্যক্তি রূপের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের একক ও অবিচ্ছিন্ন সার্বভৌম ক্ষমতার চর্চাও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু রাজা বা রাণী যা করেন মন্ত্রীসভার পরামর্শ মতই করেন। আর মন্ত্রীসভা সংসদের প্রণীত আইন দ্বারা শাসনকার্য নির্বাহ করে থাকে। আমাদের দেশে রাণী নেই, আছেন রাষ্ট্রপতি। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার মৌল ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিই সকল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও তা কার্যকর করার অধিকারী। তিনিই হবেন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক বা অভিব্যক্তি। তাঁর মধ্য দিয়েই সমগ্র সংবিধান নিজের ঐক্য বা একক ও অবিচ্ছিন্ন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখবে। সেই কারণেই এই ক্ষমতার অধীনস্থ থাকা সকল নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক এমনকি প্রধানমন্ত্রীর জন্যেও। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার এই মূল সূর বা মর্মকথা ৭২-এর সংবিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ সংবিধান কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রীকে সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করেছে এবং তিনি রাষ্ট্রপতির উর্ধ্বে বিরাজ করছেন।

৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ক্ষমতাই দেয়া হয়নি। ৪৮(৩) ধারায় বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ছাড়া রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। এ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের যে ক্ষমতা প্রদান করেছে তাও আসলে

কথার মারপ্যাঁচ। কেননা, ৫৬(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিবেন। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিতে হয়, তাই প্রকৃত অর্থে এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগের কোন সুযোগ নাই।

ভারতের মূল সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার মূল সুর প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও এ ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তারপরেও ভারতের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করে থাকেন। কিন্তু ৭২ এর সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করে থাকেন।

সরকার তথা নির্বাহী প্রধানকে অভিশংসন করার বিধান সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে না বাংলাদেশের সংবিধানে। ৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করার বিধান থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসনের কোন বিধান নেই। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর কাজের জবাবদিহিতা চাওয়ার ও আদায় করার কোন ব্যবস্থাও নাই।

৫৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী থাকবেন। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৭০-এর মাধ্যমে গোটা সংসদকে দল তথা দলীয় প্রধানের নিকট দায়বদ্ধ, অনুগত হতে বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সংসদকে যখন যে ধরনের আইন প্রণয়নের নির্দেশ দিবেন, জাতীয় সংসদ সে ধরনের আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য। এমনকি সংসদ অধিবেশনে না থাকাকালীন সময়েও রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে অধ্যাদেশ জারি করিয়ে নিতে পারেন। অনুচ্ছেদ ৭০-এর সাথে অনুচ্ছেদ ১৪২ মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি যদি দলীয় প্রধান হন, আর তাঁর দলের যদি জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তাহলে তিনি সংবিধান সংশোধনের এমন অপরিমেয় ক্ষমতা ভোগ করতে পারবেন যা পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট কল্পনাও করতে পারেন না। আর আমাদের দেশেতো সরকার প্রধান এবং দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন। অন্যদিকে শাসক শ্রেণির দলগুলোর ভিতর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা নেই বললেই চলে। কার্যতঃ দলের প্রধানের ইচ্ছা অনুযায়ী দলের বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে দলের নমিনেশন কে পাবেন তাও দলীয় প্রধান নির্ধারণ করে থাকেন। সংবিধান অনুযায়ী কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাসের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি সংরক্ষণ করেন। তবে যেহেতু রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে থাকেন, তাই কার্যত প্রধানমন্ত্রী-ই এ অধিকার সংরক্ষণ করেন।

বস্তুত ৭২ এর সংবিধান একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে সীমাহীন ক্ষমতা অর্পণ করেছে তা পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক সংবিধান তো দূরের কথা, অগণতান্ত্রিক সেনা শাসকদের কাছেও এই পরিমাণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার নজির নেই।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের প্রধান ও আবশ্যিক শর্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন যা ৭২-এর সংবিধান রচনা প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করা হয়নি।

মূলনীতি ও মৌলিক অধ্যায় অংশে অনেক ভাল ভাল কথা সন্নিবেশিত থাকলেও তা আদালত দ্বারা বলবৎ যোগ্য নয়। অর্থাৎ সরকার এগুলো বাস্তবায়নে বাধ্য নয়। উপরন্তু এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণকারী আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়া হয়েছে। এমনকি নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করার যে কোন অপরাধ থেকে নির্বাহী কর্তৃত্বকে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে। সর্বোপরি এ সংবিধানের মাধ্যমে এক ব্যক্তি তথা প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই বিদ্যমান সংবিধানের আমূল পরিবর্তন ছাড়া বাংলাদেশে গণতন্ত্র তথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

সংবিধান হল নাগরিক তথা জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের স্বীকৃতি। তাই সংবিধানে জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটে থাকে। গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা মানে স্বাধীন ও মুক্ত সত্ত্বা হিসেবে মানুষ বা নাগরিকের নিজের সুরক্ষার সনদ তৈরির প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় নাগরিক নিজেকে স্বাধীন ও মুক্তসত্ত্বা হিসেবে ভাবার সুযোগ থাকতে হয়। নিজেদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পে সাংবিধানিকরূপ দাঁড় করানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারতে হয়। ব্যক্তির ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে সমষ্টির ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে সংবিধান প্রণীত হতে হয়। তাই গোটা জাতির চেতনাতে গণতান্ত্রিক সংবিধানের আকাঙ্ক্ষা জাগরক থাকা অত্যাবশ্যক। আর তাই গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নে রাজনৈতিক, আইনি পরিবর্তনের সংগ্রামের সাথে মানুষ তথা নাগরিকের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সংগ্রাম যুক্ত।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সামাজিক আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্ককে তীব্র করতে হবে, তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। এটি ব্যাপক মানুষের চেতনাতে, উপলব্ধিতে আনতে পারতে হবে। না হলে নতুন বা ভিন্ন রূপে অগণতান্ত্রিক সংবিধান দেশবাসীর ঘাড়ে চেপে বসতে পারে।

লেখক

সেক্রেটারি জেনারেল

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

বাংলাদেশের সরকার কাঠামো

মুহাম্মাদ হাছিবুল ইসলাম

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগসমূহ বর্তমানে বাংলাদেশের সরকার কাঠামো মন্ত্রীপরিষদ শাসিত। তাই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। আর তিনি সরকার প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও তাদের কার্যক্রম নিয়েই এই নিবন্ধ। নিম্নে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ ও তার বিবরণ উল্লেখ করা হল-

১. President Office (রাষ্ট্রপতি)

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে দু'টি বিভাগ রয়েছে। যথা : পাবলিক বিভাগ ও নিজস্ব বিভাগ।

২. Prime Minister (প্রধানমন্ত্রী)

আওতাভুক্ত বিভাগসমূহ : সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিশেষ বিভাগ, বিনিয়োগ বোর্ড এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (SSF), বাংলাদেশের রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন।

৩. Ministry of Defence (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়)

অধীনস্থ বিভাগসমূহ : সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ইন্টার সার্ভিস পাবলিকেশন রিলেশন, (ISPR) প্রতিরক্ষা আর মহাঅধিদপ্তর বাংলা জরিপ অধিদপ্তর, আবহাওয়া অধিদপ্তর (SPARRSO), ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (ISSB), বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (BNCC), মিলিটারী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স টেকনোলজি, সামরিক কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ, জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ।

বি. দ্র. : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সবসময় যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন তার দায়িত্বে অত্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর অধীনে মন্ত্রণালয়টি চলছে।

৪. Ministry of Finance (অর্থ মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম একটি মন্ত্রণালয় হল অর্থ মন্ত্রণালয়। দেশের

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করপোরেশন, অর্থ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান-প্রবিধান প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে থাকে। এটি ১৯৭১ সালে গঠিত হয়েছে।

অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভাগসমূহ : অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিফরম প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ কম্পিউটার্স অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, এনবিআর, জীবনবীমা কর্পোরেশন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ও বিমসটেক এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়াও দেশটি জাতিসংঘ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব অর্থসংস্থা, কমনওয়েলথ অব নেশন্স, উন্নয়নশীল ৮টি দেশ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং ওআইসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘের সদস্য।

৫. Ministry of Education (শিক্ষা মন্ত্রণালয়)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে ১৯৭১ সালে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এই মন্ত্রণালয় মূলত বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদরাসা, কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) শিক্ষা পদ্ধতিসহ সকল শ্রেণির শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। এটি দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন পরিচালনার উদ্দেশ্যে আইন-বিধি ও প্রবিধান প্রচলন করে থাকে। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ৭৯টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক কারিগরি মহাবিদ্যালয় সহ মোট ৩৫১২১টি বিদ্যাপিঠ রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগসমূহ : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) গঠিত হয়েছে ১৯৭২। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বিএমইবি) ১৯৭৮, কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (বিডি) এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)।

স্বাধীনতার পর থেকে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন নামে পরিচিতি ছিল ১৯৭২ সালে, শিক্ষা, ধর্ম, ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৭৪ সালে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ১৯৮৪ সালে শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ১৯৯৩ সালে একক মন্ত্রণালয় হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে।

৬. Ministry of Agriculture (কৃষি মন্ত্রণালয়)

কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় ৭টি উইংয়ের সমন্বয় গঠিত যা নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, তদারকি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বাবলী : খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জনের ও টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষিনীতি প্রণয়ন। পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন বিধিমালা তৈরিকরণ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয় সাধনের জন্য নতুন কৃষি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। কৃষিনীতি পরিকল্পনা প্রজেক্ট ও নীতিমালার

তদারকি। কৃষি উপকরণ ও ভর্তুকী বিতরণ এবং স্থানীয় আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্য বিতরণের তদারকি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচিও পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান এবং অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার জন্য উন্নয়ন সহযোগিতা ও দাতা সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন।

অধীভুক্ত বিভাগসমূহ : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি ধান, কৃষি পাট, ইক্ষু, মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ইপসা, আণবিক ও কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ফলিত পুষ্টি মানবসম্পদ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি।

৭. Ministry of Public Administration (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশের বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বিভিন্ন নামে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ মন্ত্রণালয় সর্বশেষ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ছিল। বর্তমান এটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নামে পরিচিত। প্রজাতন্ত্রের গণকর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রের সেবামূলক তাৎপর্যপূর্ণ বহুমুখী দায়িত্ব পালনেও এ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ১৯৬২ সালের পূর্বে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের Home Department নিয়ন্ত্রণাধীন General Administration Branch উল্লেখিত কার্যক্রম সম্পাদন করত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। সময়ের অবর্তমানে কার্য সম্পৃক্ত নামকরণ চাহিদা অনুভূত হওয়ায় পরবর্তীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে গত ২৮ এপ্রিল ২০১১ সাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় করা হয়।

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভাগসমূহ : সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, বাংলাদেশ কর্মচারী ক্যান বোর্ড, মাঠ-প্রশাসন (বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা প্রশাসন) এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী

১. চাকুরী ব্যবস্থাপনা নিয়োগ পদ্ধতি, বয়সসীমা, যোগ্যতা, নারী-পুরুষের পদ সংরক্ষণ, উপযুক্ত পরীক্ষা, নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, শ্রেণণ, ছুটি, জ্যৈষ্ঠতা নির্ধারণ, পদোন্নতি, অবসর, পূণরায় নিয়োগ, চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ ইত্যাদি করে থাকে।
২. বেসরকারী পদে অবৈতনিক নিয়োগ।
৩. চাকুরী ও পদের শ্রেণিবিন্যাস এবং মর্যাদা নির্ধারণ সংক্রান্ত নিয়ম প্রণয়ন।
৪. ক্যাডারসমূহের নিয়োগ, সচিবালয় বিভাগ, জেলা উপজেলাসমূহে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও বদলি করা।
৫. মন্ত্রীসভার সদস্য, অন্যান্য মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের একান্তসচিব ও সহকারী সচিব নিয়োগ দান।

৬. অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট এবং এর নিয়ন্ত্রণ।

৭. আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে লিয়াজোঁ এবং দেশ ও বিশ্বসংস্থার সাথে চুক্তি, সমজোতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের কর্ম সম্পাদন করা।

৮. সার্কিট হাউজের ভাড়া নির্ধারণ ইত্যাদি।

সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব পরিবহণ কমিশনার হিসেবে অধিদপ্তর প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন।

৮. Ministry of Health and Family Welfare (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়)

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভাগসমূহ : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ইনস্টিটিউট, সেবা পরিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, পঙ্গু হাসপাতাল, বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি।

৭. Ministry of Industry (শিল্প মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সাবেক পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নামে একটি মন্ত্রণালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমান ৪টি সংস্থা ও ৬টি অধিদপ্তর এবং একটি বোর্ড কাজ করছে।

সংস্থা : বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন।

১. বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি)

২. বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএস আইসি)

৩. বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)

৪. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। (বিসিক)

৫. অধিদপ্তর সমূহ:

১. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড ট্রেডিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটি আই)

২. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশন অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

৩. বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

৪. ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

৫. পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর।

৬. প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়।

৯. Minsitry of Foreign Affairs (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

এ মন্ত্রণালয় পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করার মহান

সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভাগসমূহ : বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক কৌশলগত সমীক্ষা ইনস্টিটিউট।

১০. Ministry of Local Government Rural Development & Comperative (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে রাখা হয়। মোট কথা হল দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি অত্র মন্ত্রণালয়ের হস্তগত রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভাগসমূহ : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও সমবায় বিভাগ জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

১০. Ministry of Low Justice and Parliamentary Affairs (আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশ সরকারের অত্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের আইন প্রণয়ন তথা সংসদ বিভাগ নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকে।

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনের বিভাগসমূহ : আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, নিবন্ধন পরিদপ্তর, জেলা জজ আদালত, বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের কোন আইনের সঠিক ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণ, নীতি নির্ধারণী বিভাগসমূহ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে।

১১. Ministry of Water and Resource (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভাগসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, যৌথ নদী কমিশন, বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র।

১২. Ministry of Commerce (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)

দেশের অভ্যন্তরে ও বৈদেশিক বাণিজ্য সঠিকভাবে তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গঠিত হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভাগসমূহ : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, চা বোর্ড টেডিং করপোরেশন (TCB) ইনস্টিটিউট ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট, বীমা অধিদপ্তর, বাণিজ্য করপোরেশন অভি শুল্ক কমিশন, ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্ট অফিস, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এ্যান্ড ফার্ম ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট, আমদানি ও রপ্তানি উন্নয়ন অধিদপ্তর।

১৩. Ministry Information (তথ্য মন্ত্রণালয়)

তথ্য মন্ত্রণালয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। স্বাধীনতা পূর্ব প্রাদেশিক সরকারের নীতিও বিভিন্ন কর্মসূচি জনগণকে অবহিত করার জন্য তথ্যবিভাগ নামে একটি দপ্তর গঠন করা হয়। তৎকালীন ১৯টি জেলা তথ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হত। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় নামে একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে সকল দায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে তথ্য মন্ত্রণালয় করা হয়।

অর্পিত দায়িত্ব : রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন, ইলেকট্রিক প্রিন্ট মিডিয়া এবং আন্তঃব্যক্তির যোগাযোগের মাধ্যমে জনগণকে অভিহিত করা, গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা সম্পর্কিত তদারকি।

বিভাগসমূহ : বাংলাদেশের বেতার, তথ্য অধিদপ্তর, বাসাস, প্রেস কাউন্সিল, চলচিত্র উন্নয়ন করপোরেশন, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও চলচিত্র আর্কাইভ ইত্যাদি।

১৪. Ministry of Home Affairs (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তৎপরতা, অপরাধদমন, অপরাধী শনাক্তকরণ, জল ও মূল সীমানা নিরাপত্তা, চোরাচালান রোধ, প্রবাস ও আভাসন সম্পর্কিত নীতিমালা চুক্তি প্রণয়ন, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান রোধ, মানবপাচার রোধ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট আইন, বিধান প্রবিধান ও নিয়ম-নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

আওতাধীন বিভাগসমূহ : বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আনসার, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ জেলা বহির্গমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মূখ্য মহানগর হাকিম, কোস্ট গার্ড বাংলাদেশ, মিডিয়া গ্র্যান্ড ল সেল, র‍্যাভ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।

১৫. Ministry of Road Transport & Bridge (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়)

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে বাংলাদেশের যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ভাগ করে নতুন নামকরণ করা হয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

আওতাভুক্ত বিভাগসমূহ : বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন ও কর্তৃপক্ষ, ঢাকা যানবহন সমন্বয় বোর্ড, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

১৬. Ministry of Social Welfare (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচনকল্যাণ, উন্নয়ন ক্ষমতায়ন স্বার্থে সংশ্লিষ্ট একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। দেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে হিসেবে পরিচয় করতে বয়স্কভাতা প্রতিবন্ধীভাতা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন

করছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত ও সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

আওতাধীন মন্ত্রণালয়সমূহ : সমাজ সেবা অধিদপ্তর, জাতীয় সমাজকল্যাণ কাউন্সিল, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট এবং ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন অব ডিজাবল ডেভেলপমেন্ট।

১৭. Ministry of housing and public workers (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

আওতাধীন মন্ত্রণালয়সমূহ : গণপূর্ত অধিদপ্তর, গৃহসংস্থান অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনা কর্তৃপক্ষ, সরকারী আবাসন অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং হাউজিং এ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

১৮. Ministry of power Energy & Mineral Resource (বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন অনুসন্ধান ও উত্তোলনের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে এ মন্ত্রণালয় জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল নির্বাহী কমিটির স্থায়ী সদস্য।

অন্তর্ভুক্ত বিভাগসমূহ : জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পেট্রোলিয়াম করপোরেশন, পাওয়ার সেল এবং বাংলাদেশ তৈল গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন।

১৯. Ministry of Post Tele-Communication (ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)

২০০২ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে বিজ্ঞান এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নামধারণ করে। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের গতি বেগবান করার লক্ষ্যে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ নতুন নামধারণ করে ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। অত্র মন্ত্রণালয় দেশের ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট বিবিধ আইন বিধি বিধান প্রবিধান প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে।

আওতাধীন বিভাগসমূহ : ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশে ডাক বিভাগ, টেলিফোন শিল্পসংস্থা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোং লিঃ, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, জাদুঘর, নভোথিয়েটার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেটিক টেকনোলজি, পরমাণু শক্তি কমিশন এবং কম্পিউটার কাউন্সিল ইত্যাদি।

২০. Ministry of Railway (রেলপথ মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশের রেলওয়ে সরকারের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাত-এর প্রথম সূচনা হয় ১৮৬২ সালে ১৫ নভেম্বর দর্শনা জাগতি রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে। বর্তমানে প্রায়

সারাদেশে রেলওয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে একক মন্ত্রণালয় হিসেবে রেলপথ মন্ত্রণালয় যাত্রা শুরু করে।

দায়িত্ব সমূহ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও কৌশল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেল যোগাযোগ ব্যবহার সমন্বয় সাধন, রেলওয়ে ভাড়া নির্ধারণ, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডার এর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা।

আওতাধীন বিভাগসমূহ : বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

২১. Ministry of Women and Children Affairs (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

নারী ও শিশুর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়ন এবং সামগ্রিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গঠিত হয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

আওতাধীন বিভাগসমূহ : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।

২২. Ministry of Land (ভূমি মন্ত্রণালয়)

১৯৫০ সাল থেকে এই দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে অত্র মন্ত্রণালয়। সরকারী জমি (খাস জমি) অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ভূমি উন্নয়ন সংগ্রহ, ভূমি জরিপ ও রেকর্ড রাখা এবং আপডেট হিসেব রাখা এবং সাথে সাথে জনগণের সুবিধার জন্য ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত।

আওতাধীন বিভাগসমূহ : ভূমি আপিল বোর্ড, রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংস্কার বোর্ড, ভূমি প্রশাসন এবং পরিচালনা কমিশন।

২৩. Ministry of Labour and Employment (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)

শ্রম ও কর্মজীবী মানুষের দারিদ্রতা কমানো এবং কর্মসংস্থান তৈরি করে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে কল কারখানাসহ শিল্প জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নত উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে, শ্রমিকদের কল্যাণসাধন এবং শ্রম আইন বাস্তবায়ন করে শ্রমের ন্যূনতম মজুরী স্থির করে, লেবার কোর্টের মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আওতাধীন মন্ত্রণালয় সমূহ : শ্রম পরিদপ্তর জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তর ইত্যাদি।

২৪. Ministry of Environment and Forest (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়)

১৯৭১ সাল থেকে বনবিভাগ গঠিত হয়। ১৯৮৯ পর্যন্ত এ বিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৮৭ সময়কালে একজন সচিবের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় যাত্রা শুরু করে এবং পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে।

অন্তর্ভুক্ত সংস্থাসমূহ : পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বনবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, বন উন্নয়ন করপোরেশন, বাংলাদেশ জাতীয় হার্বেরিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি।

২৫. Ministry of Youth Sports (যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রণালয়)

অধীভুক্ত বিভাগসমূহ : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ক্রিয়া পরিদপ্তর।

২৬. Ministry of Fishers and Livestock (মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

অধীভুক্ত বিভাগসমূহ : মৎস অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, গবাদি পশু গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমি।

২৭. Ministry of Planning (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ : পরিকল্পিত ও উন্নয়ন একাডেমি, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ও কার্যক্রম বিভাগ, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশন বাস্তবায়ন পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, এসআইসিটি এবং সিপিটি ইউ।

২৮. Ministry of Religious Affairs (ধর্ম মন্ত্রণালয়)

ধর্ম মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়।

এর অধীন বিভাগসমূহ : ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়াক্ফ প্রশাসকের দপ্তর, হজ্জ উইং জেদ্দা, হাজীক্যাম্প, হিন্দু ও বৌদ্ধকল্যাণ ট্রাস্ট ইত্যাদি।

২৯. Ministry of Civil Aviation & Tourism (বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়)

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, পর্যটন করপোরেশন, বিমান করপোরেশন, সোনারগাঁও এবং শেরাটন হোটেল ও বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস।

৩০. Ministry of Food and Disaster Management (খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়)

অধীনস্থ বিভাগসমূহ : খাদ্য বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ।

৩১. Ministry of Cultural Affairs (সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়)

অধীনস্থ বিভাগসমূহ : প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তর, আর্কাইভ ও লাইব্রেরি অধিদপ্তর, কপিরাইট অফিস, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি ইত্যাদি।

৩২. Ministry of Shipping and Transport (নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়)

বিভাগসমূহ : বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা, শিপিং করপোরেশন, চট্টগ্রাম, মংলা, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর এবং নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তর।

৩৩. Ministry of Expatriate Welfare & oversea Employment

(প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়)

অধিভুক্ত বিভাগসমূহ : জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশাসনিক ব্যুরো, BOESL, BAIRA ইত্যাদি।

৩৪. Ministry of Primary and Mass Education (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)

৩৫. Ministry of Chittagong Hills Affairs (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

৩৬. Ministry of Liberational War Affairs (মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

.....

লেখক

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক সম্পাদক

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

মুহাম্মাদ নূরুল করীম আকরাম

বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বেশ কয়েকটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ সরকারের আইনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন :

১. বিচার বিভাগ
২. নির্বাহী বিভাগ
৩. নির্বাচন কমিশন
৪. আইন বিভাগ
৫. সরকারি কর্ম কমিশন
৬. অ্যাটর্নি জেনারেল
৭. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
৮. মানবাধিকার কমিশন

বিচার বিভাগ

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ মূলত (ক) উচ্চতর বিচার বিভাগ (সুপ্রীম কোর্ট) ও (খ) অধস্তন বিচার বিভাগ (নিম্ন আদালত) এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

সুপ্রীম কোর্ট : সুপ্রীম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং এটি দুটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। যথা : হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও প্রত্যেক বিভাগের বিচারপতিদের সমন্বয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়। সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ বিচার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ দান করেন। সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবীদের মধ্য থেকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ করা হয়।

হাইকোর্ট : হাইকোর্ট বিচারকার্য পর্যালোচনার ক্ষমতার অধিকারী। যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগ প্রজাতন্ত্রের যেকোন কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিসহ যেকোন ব্যক্তি বা

প্রতিষ্ঠানের ওপর সংবিধানে প্রদত্ত যেকোন মৌলিক অধিকার কার্যকর করার নির্দেশনা বা আদেশ জারি করতে পারে। হাইকোর্ট মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি দেখতে পায় যে, কোনও আইন মৌলিক অধিকার বা সংবিধানের অন্য যে কোন অংশের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহলে সে আইনের ততটুকু অকার্যকর ঘোষণা করতে পারে যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কোম্পানি, এডমিরালটি, বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রেও হাইকোর্টের মৌলিক এখতিয়ার রয়েছে। অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোনও মামলার ক্ষেত্রে যদি সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত আইনের প্রশ্ন বা জনগুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় দেখা দেয়, তাহলে হাইকোর্ট সে মামলা অধস্তন আদালত থেকে প্রত্যাহার করে তার নিষ্পত্তি করতে পারে। হাইকোর্ট বিভাগের আপিল বিবেচনা ও পর্যালোচনার এখতিয়ার রয়েছে। হাইকোর্ট যদি এ মর্মে প্রত্যয়ন করে যে, হাইকোর্টে প্রদত্ত কোনও রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডদেশের সঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আইনের প্রশ্ন জড়িত, বা হাইকোর্ট কোনও ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তি প্রদান করেছে, তাহলে ওই সব রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করা যাবে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগই রেকর্ড আদালত।

নিম্ন আদালত কার্যাদির ভিন্নতায় পাঁচ প্রকার :

১. দেওয়ানি বিচার বিভাগ : অধস্তন দেওয়ানি আদালত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা : সহকারি জজের আদালত, সাবজজ আদালত, অতিরিক্ত জজের আদালত এবং জেলা জজের আদালত। প্রত্যেক জেলার বিচার বিভাগের প্রধান হলেন জেলা জজ। পার্বত্য জেলাসমূহে পৃথক কোনও দেওয়ানি আদালত নেই; সেসব জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটগণ দেওয়ানি আদালতের কার্য সমাধা করেন। হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রতিটি জেলার সকল দেওয়ানি আদালত পরিচালনার দায়িত্ব থাকে জেলা জজের হাতে। জেলা জজ প্রধানত আপিল মামলা বিচারের এখতিয়ার রাখেন, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার মূল মামলার বিচার এখতিয়ারও রয়েছে। অতিরিক্ত জজের বিচার এখতিয়ার জেলা জজের এখতিয়ারের সঙ্গে সমবিস্তৃত ও যৌথ। তিনি জেলা জজ কর্তৃক নির্ধারিত মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করেন। সহকারি জজ ও অধস্তন বিচারকদের প্রদত্ত রায়, ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল পেশ করা হয় জেলা জজের আদালতে। একইভাবে সহকারি জজদের প্রদত্ত রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্পত্তির জন্য জেলা জজ সেগুলি অধস্তন আদালতে স্থানান্তর করতে পারেন। অধস্তন আদালতগুলোর হাতেই থাকে মূলত মূল দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির অবাধ এখতিয়ার।

২. অর্থ ঋণ আদালত : অর্থ ঋণ আদালত আইন ১৯৯০-এর অধীনে সরকার প্রতিটি জেলায় একটি করে অর্থ ঋণ আদালত স্থাপন করেছে। সরকার সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এসব আদালতের বিচারক হিসেবে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ করে। ব্যাংক, বিনিয়োগ কর্পোরেশন, গৃহনির্মাণ, অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, লিজিং কোম্পানিসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন ১৯৯৩-এর

বিধানাবলী অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ সংক্রান্ত সকল মামলা অর্থ ঋণ আদালতে দায়ের করতে হয় এবং শুধুমাত্র এ আদালতই এসব মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন করে। অর্থঋণ আদালত একটি দেওয়ানি আদালত। দেওয়ানি আদালতের সকল ক্ষমতাই এ আদালতের রয়েছে।

৩. দেউলিয়া আদালত : এ আদালত দেউলিয়া আইন ১৯৯৭-এর অধীনে গঠিত। প্রত্যেক জেলায় জেলা আদালতই হচ্ছে ঐ জেলার দেউলিয়া আদালত। জেলা জজ এ আদালতের প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। জেলার সীমানায় দেউলিয়া মামলাগুলি নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত। প্রয়োজনবোধে তিনি একজন অতিরিক্ত (জেলা) জজের উপরও অনুরূপ মামলার বিচারকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন।

৪. অধস্তন ফৌজদারি ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালত : অধস্তন ফৌজদারি আদালত পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা : (ক) দায়রা আদালত। (খ) মহানগর হাকিমের আদালত। (গ) প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। (ঘ) দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং (ঙ) তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। তিনটি পার্বত্য জেলায় দায়রা আদালতের কাজ করেন বিভাগীয় কমিশনার। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে মহানগর পৌর এলাকার জন্য মহানগর দায়রা আদালত গঠন করা হয়।

৫. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল : কোনও আইনবলে বা আইনের দ্বারা সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পত্তি বা সরকারের ব্যবস্থাপনাধীন সম্পত্তি, প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনও ব্যক্তির চাকরির শর্তাবলি ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্ভূত বিষয়াদি নিষ্পত্তির আইনগত এখতিয়ার দিয়ে জাতীয় সংসদ আইনবলে এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারে।

নির্বাহী বিভাগ

যে কোন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তিনটি মূল স্তরের ওপর নির্ভরশীল। নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনসভা। সদ্যস্বাধীন অধিকাংশ রাষ্ট্রই সংবিধান প্রণয়নকালে সরকারের নির্বাহী বিভাগের ধারণা, প্রকৃতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে সতর্ক থেকেছে। পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী ব্যবস্থা গঠনের জন্য কতিপয় অনুসরণীয় মডেল রয়েছে। বাংলাদেশে নির্বাহী ব্যবস্থা গঠনে পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রপতিশাসিত ও সংসদীয় মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের আইনগত ভিত্তি ছিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

এ ঘোষণা আদেশের ভিত্তিতে রচিত সংবিধান রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে এক সর্বময় ক্ষমতাস্বত্বের নির্বাহী সৃষ্টি করে। ক্ষমা মঞ্জুরের ক্ষমতাসহ নির্বাহী ও বিধানিক উভয় ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। প্রয়োজনবোধে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা ছিল তার। সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও তা বিলুপ্তির এবং করদার্য ও অর্থব্যয়ের একচেটিয়া ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছিল। অধিকন্তু, বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে বিদ্যমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে

এ ঘোষণা সর্বময় ক্ষমতাস্বত্ব রাষ্ট্রপতির মধ্যে একটি নির্বাহ ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ এর আওতায় নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনের সভাপতিরূপে কাজ করবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হল রাষ্ট্রপতি ও সংসদে নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটের তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ, আইন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন পরিচালনা (এর মধ্যে সকল স্থানীয় সরকার পরিষদ যেমন : ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ অন্তর্ভুক্ত) এবং আনুষঙ্গিক কার্যাদির সূচী সম্পাদন। দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন। নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা : (১১৮ (৪) অনুচ্ছেদ এবং ১২৬(৪) অনুচ্ছেদ-১৯৭২ সাল) গণপ্রতিনিধিত্ব আইনানুযায়ী নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং শুধুমাত্র সংবিধান ও আইনের অধীনে থাকবেন। আইনত নির্বাচন কমিশন এর সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষমতা প্রদর্শন এবং কার্য সম্পাদনের কর্তৃত্ব এর চেয়ারম্যান/ যেকোনো সদস্য/ যেকোনো কর্মকর্তাকে দিতে পারেন। উল্লেখিত আইনানুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। কমিশন প্রয়োজন বোধ করলে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে যেকোনো সহায়তার জন্য যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে নিয়োগ দিতে পারেন।

কর্মকৌশল :

১. প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন।

২. একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিরূপে কাজ করবেন।

৩. এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বৎসরকাল হবে এবং

ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না। খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মবিসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না।

গ) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন।

৪. সংসদ প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেমনটি নির্ধারণ করবেন, তেমনটিই হবে। তবে শর্ত থাকবে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হন, সে পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

৫. কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

১. রাষ্ট্রপতি পদ ও সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী-

ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন আয়োজন করবেন;

খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন আয়োজন করবেন;

গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবেন; এবং

ঘ) রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করবেন।

২. উপর্যুক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যে দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে, নির্বাচন কমিশন সে দায়িত্ব পালন করবেন।

ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা

১. প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. কোন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারী হবেন,

ক) যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

খ) তার বয়স আঠার বছরের কম না হয়;

গ) কোন যোগ্য আদালত তার সম্পর্কে অগ্রকৃতস্থ বলে ঘোষণা বহাল না থাকে;

ঘ) তিনি যদি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং

ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হয়ে থাকেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়

১. রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পরবর্তী ষাট থেকে নব্বই দিনের মধ্যে শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকবে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হয়েছেন সে সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্যপদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হতে ত্রিশ দিনের

মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্যপদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ক) মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং
খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে সে ক্ষেত্রে ভাঙ্গার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে। তবে শর্ত থাকবে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করবেন না।

আইন বিভাগ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষকে কতকগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। এ বিধিনিষেধগুলোকে আইন বলে অভিহিত করা হয়। আইন আদর্শ জীবন প্রবাহের পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে থাকে।

শব্দগত অর্থ : আইনের ইংরেজী প্রতিশব্দ Law এর উৎপত্তি টিউটনিক মূল শব্দ “Lag” থেকে নেওয়া হয়েছে; যার অর্থ স্থির বা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং অর্থগত এবং উৎপত্তিগত দিক থেকে আইন বলতে কতিপয় নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর সমষ্টিকে বোঝায়।

আইনের প্রামাণ্য সংজ্ঞা : অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, “আইন হলো সেই সাধারণ নিয়ম; যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত হয়।”

এরিস্টটলের মতে, “সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হলো আইন।”

উইলসনের মতে, “আইন হলো মানুষের স্থায়ী আচার ব্যবহার ও চিন্তাধারার সে অংশ যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে।”

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)

সংক্ষেপে : বিপিএসসি।

গঠিত : ২২ ডিসেম্বর-১৯৭৭।

আইনি অবস্থা : সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

অবস্থান : আগারগাঁও, ঢাকা।

দাপ্তরিক ভাষা : বাংলা, ইংরেজি।

চেয়ারম্যান : একরাম আহমেদ।

বাজেট : ৩০.৬ কোটি টাকা। (২০১৫-১৬ অর্থ বছর)

‘পাবলিক সার্ভিস কমিশন (BPSC) বাংলাদেশ’ একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যার দায়িত্ব সরকারী চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা। কখনো-কখনো এটিকে সরকারী কর্ম কমিশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এটি একটি আধা বিচারিক, স্বাধীন সংস্থা। পাকিস্তান আমলের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উত্তরাধিকার হিসাবেই বাংলাদেশে গঠিত হয়েছিল পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭ থেকে ১৪১ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বর্ণিত আছে। একজন চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন সদস্য সম্বায়ে পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য কমিশন গঠিত হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিয়োগ প্রদান করেন।

সংক্ষিপ্ত তথ্য :

ক) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা বিপিএসসি একটি সাংবিধানিক এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। এই কমিশনের প্রধানের পদবী হবে চেয়ারম্যান।

খ) সংবিধানের ১৩৭নং অনুচ্ছেদ বলে এই কমিশন গঠিত হয়েছে।

গ) বর্তমান বিসিএস ক্যাডার পদসংখ্যা ২৮টি। এর আগে এটি ছিল ২৯টি।

ঘ) উপমহাদেশে প্রথম সরকারী কর্মকমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে।

ঙ) বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালে।

চ) এই কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন ড. এ কিউ এম বজলুল করিম।

ছ) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপিকা ড. জিন্নাতুল্লাহ তাহমিনা বেগম।

জ) পিএসসির বর্তমান ১৩ তম চেয়ারম্যান ইকরাম আহমেদ।

গঠন : বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে প্রথমাবস্থায় ২টি ‘পাবলিক সার্ভিস কমিশন’ গঠন করে, যা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (প্রথম) এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (দ্বিতীয়) নামে অভিহিত হয়; কিন্তু পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধন করত: উভয় কমিশনকে একত্রিত করে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন নামে একটিমাত্র কমিশন পদ্ধতি চালু করা হয়। ভারত উপমহাদেশে ১৯২৬ সালে প্রথম পাবলিক সার্ভিস কমিশন নামে একটি কমিশন গঠিত হয় এবং এটি ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োগ দানের কার্যক্রম পরিচালনা করত। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন এবং পরবর্তী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হওয়ার পর ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ প্রদেশ পর্যায়েও অনুরূপ কমিশন গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ব্রিটিশ ভারতের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আদলে পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় পর্যায়েই অনুরূপ পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়। এভাবেই আইনগত ভিত্তির পরিবর্তে বরং সাংবিধানিক ভিত্তিই বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের সংবিধানের পাঁচটি অনুচ্ছেদ সংবলিত একটি অধ্যায়ে (৯ম ভাগের ২য়) কমিশনের গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলি নির্দেশিত হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক (কার্যত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে) পাঁচ বছর মেয়াদে অথবা তাদের বয়স বাষট্টি বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নিয়োগযোগ্য সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সদস্যের সংখ্যা সংবিধানে নির্দিষ্ট করা হয় নি। তবে ১৯৭৭ সালে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশে চেয়ারম্যানসহ এ সংখ্যা সর্বোচ্চ পনেরো (ন্যূনতম ছয়) নির্ধারণ করা হয়েছে।

কার্যাবলী : পাবলিক সার্ভিস কমিশন সাধারণত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে :

১. সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগ দানের জন্য লোক বাছাই করার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা/অথবা সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
 ২. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ প্রত্যাশী প্রার্থীদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও মেধাযাচাই পরীক্ষার ব্যবস্থা।
 ৩. সরকারি কর্মকর্তাদের এক চাকরি থেকে অন্য চাকরিতে পদোন্নতি (যথা ২য় শ্রেণি থেকে ১ম শ্রেণিতে) দানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা এবং/অথবা সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
 ৪. সরকারি চাকরিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে স্থায়ী চাকরিতে নিয়োগদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচন।
 ৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনস্থ অ্যাডহক ভিত্তিক নিয়োগ অনুমোদন।
 ৬. নিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি, নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা, সরকারি চাকরিতে পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যকার পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নিরূপণের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান।
 ৭. বিভাগীয় ও পেশাগত বিভিন্ন পরীক্ষার নিয়মাবলি ও পাঠ্যসূচি পরীক্ষা ও অনুমোদন এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য সেসব পরীক্ষার আয়োজন।
 ৮. সরকারি কর্মচারীদের চাকরির শর্তাদি প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে পরামর্শ দান; এবং
 ৯. সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন শৃঙ্খলা ও আপীল বিষয়ে পরামর্শ দান। অধিকন্তু, কমিশন সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের ব্যাপারে কর্মী-বিষয়ক গবেষণার কিছু কাজও করে, যেমন প্রার্থীদের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ ও পরিসংখ্যানগতভাবে তাদের প্রবণতাগুলি (শিক্ষাগত, আর্থ-সামাজিক, আঞ্চলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটসহ) বিশ্লেষণ।
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা দানের জন্য কমিশনের একটি সচিবালয় রয়েছে। কাঠামোগত অবস্থানের দিক থেকে এটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একটি অংশ এবং মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগের সম-মর্যাদাসম্পন্ন। রাজধানী শহরে (ঢাকায়) অবস্থিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদর দপ্তরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মোট ১০টি সার্ভিস শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেমন সংস্থাপন শাখা, হিসাব শাখা, পরীক্ষা শাখা, নিয়োগ শাখা, মনস্তত্ত্ব শাখা, গবেষণা শাখা ও গ্রন্থাগার শাখা ইত্যাদি। এছাড়া পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মোট ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মধ্যে ৫টি রাজধানীর বাইরের বিভাগীয় সদরে এবং ঢাকা বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট অবশিষ্টটি রাজধানীতে কমিশনের কেন্দ্রীয় সচিবালয় ভবনে অবস্থিত। আঞ্চলিক অফিসগুলি কার্যত যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসের ভূমিকাই পালন করে থাকে। কমিশন সচিবালয়ে নিয়োজিত সচিব হলেন এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব এবং কমিশন সচিবালয়ে প্রেষণে নিয়োগকৃত। সচিবের সহযোগী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন ১ জন যুগ্মসচিব, ১ জন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ১ জন প্রধান মনোবিজ্ঞানি, ২ জন উপসচিব ও ৭ জন পরিচালক।

অ্যাটর্নি জেনারেল

সংবিধানের ৬৪(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হতে পারবেন। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উত্থাপিত যেকোনো রেফারেন্সের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মত প্রকাশ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (সিএজি) এর কার্যালয়কে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। সিএজি কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রজাতন্ত্রের সরকারি একাউন্টস, সরকারি এজেন্সি, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পাবলিক কোম্পানিসমূহের অডিট পরিচালনা করা হয় এবং তা সংসদে উপস্থাপিত হয়। সিএজি কার্যালয় সরকারি সম্পদ ব্যবহারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

নিরীক্ষণ : (অডিটিং) আর্থিক কাজকর্ম ও ঘটনাবলী সম্পর্কে নিয়মানুগ পন্থায় নিরপেক্ষ মূল্যায়ন- যার লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান নীতিমালা ও সম্পাদিত কাজকর্মের মধ্যে কতটুকু অসঙ্গতি রয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী ও সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যের পরীক্ষা মাত্র এবং এ পরীক্ষার ফলাফল বিশেষ মতামত হিসেবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট প্রদান করা। বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানির হিসাব নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক। ২১৩(৩) ধারা অনুযায়ী নিরীক্ষককে বার্ষিক সাধারণ সভায় পরীক্ষিত হিসাব-সম্পর্কিত মতামত প্রদান করতে হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউট কর্তৃক আন্তর্জাতিক নিরীক্ষামান গ্রহণের পূর্বে নিরীক্ষার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল : ১. হিসাবে ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্নীতি নির্ধারণ ২. ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্নীতি সংগঠন বন্ধ করা। যেমন- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন, ১৯৯১ সালের ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৩৮ সালের বীমা আইন, ১৯৯৩ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৮৭ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রুলস, ১৯৭৮ সালের বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ রুলস এবং ১৯৮৪ সালের কো-অপারেটিভ সোসাইটি অধ্যাদেশ। এই নিরীক্ষা কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্টারার অথবা তার অনুমোদিত অন্য কোন অফিসার সম্পাদন করে থাকেন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কর্পোরেশনের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাব তিন স্তরে নিরীক্ষা করা হয় :

১. প্রাথমিক কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
২. মাধ্যমিক স্বাধীন পেশাজীবী নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান ও
৩. বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল

বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৮ ধারা মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব সিয়ান্ডএজি-কে প্রদান করা হয়েছে। সিয়ান্ডএজি-কে সংসদে প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। প্রজাতন্ত্র ও কোর্ট অব ল'-এর হিসাব, অন্যান্য কর্তৃপক্ষ

ও সরকারি অফিসারদের হিসাব সিয়্যাম্ভএজি-কে নিরীক্ষা করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তার অথবা তার অনুমোদিত অন্য কোন প্রতিনিধির সকল হিসাব-বই, ভাউচার, দলিল, নগদান, স্ট্যাম্প, সিকিউরিটিজ, গুদাম ও অন্যান্য সরকারি সম্পত্তি দেখার অধিকার আছে। কাজ চালাবার ক্ষেত্রে সিয়্যাম্ভএজি কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ নন। সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং অধীনস্থ দশজন ডাইরেক্টর জেনারেলের সহায়তায় তিনি সরকারি সকল বিভাগ, এজেন্সি, পাবলিক সেক্টর করপোরেশন এবং যে সকল পাবলিক কোম্পানিতে সরকারের ৫০% মালিকানা আছে তার নিরীক্ষা করে থাকেন।

সরকারি নিরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো সরকারি ব্যবস্থাপনায় সম্পদ ব্যবহারের স্বচ্ছতা ও দায়িত্বের নিশ্চয়তা দান করা। এই উদ্দেশ্য সম্পাদনে নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি হলো- হিসাব, আয়-ব্যয় বিবরণ সঠিকভাবে তৈরি করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার যথার্থতা বিচার-বিবেচনা করা, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ব্যবহারে কার্যকারিতা, দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার নিশ্চয়তা প্রদান, সরকারি মালিকানার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্র ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, উৎপাদন হিসাব, লাভ-ক্ষতি হিসাব ও সহকারি হিসাব বই পরীক্ষা করা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা জানার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান কাজ সম্পাদন। সিয়্যাম্ভএজি-র অধীনে নিম্নলিখিত অডিট ডাইরেক্টরেট ও প্রশিক্ষণ একাডেমি ন্যস্ত করা হয়েছে :

(ক) বাণিজ্যিক নিরীক্ষা (খ) পূর্ত নিরীক্ষা (গ) বৈদেশিক সাহায্যধীন প্রকল্প নিরীক্ষা (ঘ) বেসামরিক নিরীক্ষা (ঙ) রেলওয়ে নিরীক্ষা (চ) ডাক, তার ও টেলিফোন নিরীক্ষা (ছ) প্রতিরক্ষা নিরীক্ষা (জ) বৈদেশিক মিশন নিরীক্ষা (ঝ) কৃতি নিরীক্ষা (ঞ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা একাডেমি।

উপর্যুক্ত বিভাগগুলোর প্রধানকে ডাইরেক্টর জেনারেল বলা হয়। প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব কাজের কাঠামো রয়েছে।

বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তরটি স্থাপন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয়করণের জন্য বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগের কাজের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এই অধিদপ্তর সকল স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকসহ ৫০% সরকারি মালিকানা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করে। এই অধিদপ্তর যে সকল দায়িত্ব পালন করে থাকে তা হলো : সকল সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক ও চূড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষা; স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান ও নিরীক্ষা শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীগুলি ঐ প্রতিষ্ঠানের গুদ ও সঠিক আর্থিক অবস্থা দেখাচ্ছে কি-না তা নির্ধারণ; বিধিবদ্ধ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সর্ধক্ষিপ্ত হিসাব সহকারে সাধারণ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা; উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃকাজের মূল্যায়ন করা এবং সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক

প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা, দক্ষতা ও মিতাচারিতা পরিমাপ করা।
সিঅ্যান্ডএজি-র অনুমোদনের পর গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়মসমূহ নিরীক্ষা মন্তব্য সহকারে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন সিঅ্যান্ডএজি কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নিকট সংসদে প্রেরণের জন্য উপস্থাপন করে। সংসদে উপস্থাপিত প্রতিবেদন পাবলিক একাউন্টস (পিএসি) কমিটি কর্তৃক আলোচিত হয়। সংসদের একটি স্থায়ী কমিটি যা পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটি (পিইউসি) নামে পরিচিত সে কমিটি ‘সংসদ কার্যপ্রণালী বিধি’র বিধি ২৩৮ মোতাবেক সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরীক্ষা করে দেখেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা অনেক দিনের। এ লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের শেষের দিকে প্রথমবারের মতো একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে মানবাধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (আইডিএইচআরবি) শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৬-২০০১ সাল নাগাদ মানবাধিকারের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আইনি কাঠামোর খসড়া তৈরির কাজ পরিচালিত হয়। পরে ২০০১ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার কমিশন গঠন করার সম্ভাবনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি মানবাধিকার কমিশন গঠনের আইন প্রণয়নের সাথে সাথে মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে একটি পরিপূর্ণ আইন তৈরিরও সুপারিশ করে। ২০০৩ সালের ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত কয়েক দফা আলোচনার পর এই কমিটি একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণ করে। কিন্তু এই বিলটি মন্ত্রিপরিষদের সভায় উত্থাপন করা হয় নি। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানবাধিকার কমিশন গঠনের উদ্যোগের ঘোষণা দেয়। ২০০৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে উপদেষ্টা পরিষদে একটি খসড়া উত্থাপন করে। পরিষদ নীতিগতভাবে খসড়া অনুমোদন করে এবং আইন সচিবের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটিকে খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদনের মধ্য দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুনরায় প্রেরণের জন্য আদেশ দেয়া হয়। পুনঃসংস্কার করা প্রস্তাবটি আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরবর্তী সময়ে উপদেষ্টা পরিষদে পেশ করে এবং ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর তা অনুমোদন লাভ করে।

অনুমোদন লাভের পর ২০০৭ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশের অধীনে একজন সভাপতি এবং আরো দু’জন কমিশনার নিয়ে ২০০৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কাজ শুরু করে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী, কমিশনের সভাপতি হবেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, অন্য দু’জন কমিশনারের একজন হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আরেকজন হবেন মানবাধিকার আন্দোলনের সমর্থক কোনো নারী নেত্রী। অধ্যাদেশ

বলে কমিশনের সভাপতি হবেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কমিশনের সদস্যগণ একটি নির্বাচনী কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ লাভ করবেন। কমিশনের কোনো সদস্যের বয়স ৫০ বছরের নিচে এবং ৭২ বছরের ঊর্ধ্বে হবে না। কমিশনের সভাপতি এবং অন্য সদস্যরা তিন বছরের মেয়াদে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং মেয়াদ শেষে দ্বিতীয় বারের মতো নিয়োগ লাভ করলে শুধু সেই মেয়াদেই দায়িত্ব পালন করবেন এবং তা পুনরায় আর বাড়ানো হবে না। সদস্য নির্বাচক যে কমিটি, তা গঠিত হবে ছয়জন সদস্যের সমন্বয়ে। এদের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি কমিটির সভাপতি হবেন। মন্ত্রিপরিষদের একজন সচিব, বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশের মহা হিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি, আইন বিচার এবং সংসদীয় কমিটির সচিব যিনি কমিটিকে সচিবালয়ের যে সকল সহায়তা প্রয়োজন তা প্রদান করবেন। সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি যে পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ায় পদ থেকে অপসারিত হন, মানবাধিকার কমিশনের নির্বাচক কমিটির সভাপতি এবং অন্য সদস্যবৃন্দ একই পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ায় তাটদের কর্ম থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। এই কমিশন আইনগতভাবে একটি বৈধ সংস্থা হিসেবে নিজস্ব সিলমোহর এবং স্থায়ী দায়াদিকার এবং নিজস্ব নামে যেকোন মামলায় বাদী বা বিবাদী হওয়ার অধিকার ভোগ করবে।

এই কমিশন অন্যান্য দায়িত্বের সাথে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনে দায়বদ্ধ থাকবে :

(ক) জারি করা সুয়োমটো রুলের তদন্ত করা অথবা কোনো ব্যক্তি, রাষ্ট্র অথবা সরকারের কোনো অংশের অথবা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মানবাধিকারের কোনো লঙ্ঘন অথবা মানবাধিকারের লঙ্ঘন করতে উস্কানি দেয়া বা প্ররোচিত করা এমন কোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিজের করা অভিযোগের অথবা তার পক্ষের হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির দায়ের করা অভিযোগের তদন্ত করা।

(খ) জারি করা সুয়োমটো রুলের তদন্ত করা অথবা সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা মানবাধিকারের কোনো লঙ্ঘন অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা নিতে অবহেলা বা উপেক্ষা করা এমন কোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিজের দায়ের করা অভিযোগের অথবা তার পক্ষের হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির করা অভিযোগের তদন্ত করা।

কমিশন কোনো অভিযোগের তদন্তকালে যে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তাদের বক্তব্যও শুনবে, এছাড়া বাদী এবং তার সাক্ষীদের প্রতি সমন জারি করার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকা যেকোন ধরনের ডকুমেন্ট কমিশনের সামনে উপস্থাপন করার আদেশ দেবার ক্ষমতা কমিশনের থাকবে। সব ধরনের তদন্ত শেষ করে কমিশন যদি অভিযোগটির সত্যতা খুঁজে পায় তাহলে সে সরকারকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অথবা অন্য যেকোন ধরনের আইনি পদক্ষেপ ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিতে বলতে পারে যিনি আইনগত ব্যবস্থা অথবা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণকারী বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আছেন। বিষয়টি সংবিধানের ১০২ ধারার অধীনে নিষ্পত্তি যোগ্য হলে কমিশন নিজে অথবা ক্ষুদ্র

ব্যক্তির পক্ষ হয়ে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে পিটিশন ফাইল করতে পারে। উপযুক্ত মনে করলে কমিশন ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে অথবা তার পরিবারকে স্বল্পকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের নিকট অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারে। তদন্ত শেষে কমিশন তার তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট অথবা তার প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করবে। এছাড়াও কমিশন সুপারিশমালাসহ তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে এবং রিপোর্ট গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কমিশনের দেয়া সুপারিশমালার ভিত্তিতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে অথবা পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে তা কমিশনকে অবহিত করবে। কমিশনের প্রেরিত সুপারিশমালার সাথে যদি সরকার অথবা এ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতপার্থক্য ঘটে অথবা এই সুপারিশমালার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যদি অপারগতা প্রকাশ করে অথবা প্রত্যাখান করে তাহলে কমিশনের নিকট এই সময়ের মধ্যেই তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ এবং কেন তারা এর বাস্তবায়নে অক্ষম এবং প্রত্যাখান করেছে তার কারণ দর্শাতে হবে। কমিশন তার সংশ্লিষ্ট তদন্ত রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করবে এবং এখানে কমিশনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা সুপারিশমালা কমিশনের বিবেচনায় যতটুকু থাকা উচিত ততটুকুই থাকবে। যদি কোনো তদন্ত রিপোর্ট কমিশনের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, এবং কমিশন যদি মনে করে তদন্ত রিপোর্টের পুরো অংশ বা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত অংশ বিশেষ জনগণের সম্মুখে প্রকাশ করা উচিত, তাহলে কমিশন তদন্ত রিপোর্টের পুরো অংশ অথবা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত অংশবিশেষ প্রকাশ করতে পারে। প্রতি বছর ৩০ মার্চের মধ্যে রাষ্ট্রপতির নিকট কমিশনকে তার কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। বাৎসরিক রিপোর্টের সাথে একটি মেমোরেন্ডামও যুক্ত থাকবে, যেখানে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কর্তৃপক্ষ কমিশনের প্রদত্ত সুপারিশমালা কার্যকর করার জন্য আইনি উদ্যোগ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কেন ব্যর্থ বা অপারগ হয়েছে তার কারণগুলো উল্লেখ থাকবে।

মানবাধিকার কী ও কেন?

মানুষের বিকাশ এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধাগুলোই মানবাধিকার। মানবাধিকার হচ্ছে মানুষের জন্মগত অধিকার এবং এগুলো মানুষের মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত। ‘মানুষ’ হিসেবে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এ অধিকারগুলো অত্যাবশ্যক। মানবাধিকারকে এক কথায় ‘সব ধরনের ভয় এবং অভাব থেকে মুক্তি’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়। সেখানে মানুষের মৌলিক মানবাধিকারগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এ জন্য ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালিত হয়। মানবাধিকারের কিছু মূলনীতি রয়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রথম অনুচ্ছেদেই (অনুচ্ছেদ-১) এর উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- ‘সকল মানুষ স্বাধীনভাবে জন্ম গ্রহণ করে এবং মর্যাদা ও অধিকারে সব মানুষ সমান’। মানবাধিকার সর্বজনীন। একজন মানুষ যে

দেশেরই নাগরিক হোন না কেন, যেখানেই বসবাস করুন না কেন, তিনি যে ধর্মের, বর্ণের, লিঙ্গের, জাতির বা ভাষার মানুষ হোন না কেন পৃথিবীর সব মানুষ সমভাবে সব মানবাধিকার ভোগ করার অধিকারী। এই অধিকারগুলো কোনো অবস্থাতেই কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কেউ স্বেচ্ছায় কোনো অধিকার ত্যাগও করতে পারে না। মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত অধিকারগুলো অবিচ্ছেদ্য, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। একটি অধিকারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অন্য অধিকারকে যেমন এগিয়ে নেয় তেমনিভাবে এক অধিকারের লংঘন অন্য অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে গৃহীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে ‘নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার’ এবং ‘অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার’- এই দু’টি ধারায় মানুষের মানবাধিকারসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার

১. জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার
২. দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার
৩. নির্যাতন ও অবমূল্যায়ন থেকে মুক্তির অধিকার
৪. আইনের চোখে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার
৫. আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং আইনের আশ্রয় সমানভাবে পাওয়ার অধিকার
৬. উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার পাওয়ার অধিকার
৭. বেআইনী আটক ও বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের অধিকার
৮. নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য শুনানীর অধিকার
৯. অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ ব্যক্তির মতো আচরণ পাওয়ার অধিকার
১০. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
১১. চলাফেরার স্বাধীনতা
১২. অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার অধিকার
১৩. জাতীয়তা পাওয়া এবং পরিবর্তন করার অধিকার
১৪. স্বেচ্ছায় পরিবার গঠন করার অধিকার
১৫. সম্পত্তি অর্জনের অধিকার
১৬. নিজস্ব বিশ্বাস ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার
১৭. মতামত দেওয়া ও তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা
১৮. শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার
১৯. স্বাধীনভাবে নির্বাচনে ও সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার
২০. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার
২১. কাজকৃত কাজ পাওয়া ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার
২২. অবসর ও বিশ্রাম পাওয়ার অধিকার
২৩. পূর্ণ জীবন-যাত্রার অধিকার
২৪. শিক্ষার অধিকার

২৫. সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার

পরবর্তী কালে ১৯৬৬ সালে এই দুই ধরনের অধিকারকে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এবং অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে সকল পক্ষের দায় দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে পৃথক দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তি গৃহীত হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক বা জনগোষ্ঠীভিত্তিক অধিকারকে বিস্তৃত করে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদ গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে এ ধরনের মোট ৯টি প্রধান আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে; যেমন : ১. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক সনদ (গৃহীত- ১৯৬৬, কার্যকর- ১৯৭৬) ২. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তি (গৃহীত- ১৯৬৬, কার্যকর- ১৯৭৬) ৩. সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ (গৃহীত- ১৯৬৫, কার্যকর- ১৯৬৯) ৪. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (গৃহীত- ১৯৭৯, কার্যকর- ১৯৮১) ৫. নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী সনদ (গৃহীত- ১৯৮৪, কার্যকর- ১৯৮৭) ৬. শিশু অধিকার সনদ (গৃহীত- ১৯৮৯, কার্যকর- ১৯৯০) ৭. অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ রক্ষা সনদ (গৃহীত- ১৯৯০, কার্যকর-২০০৩) ৮. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত সনদ (গৃহীত- ২০০৬, কার্যকর- ২০০৮) ৯. বলপূর্বক অন্তর্ধান থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষা সংক্রান্ত সনদ (গৃহীত- ২০০৬, কার্যকর- ২০১০)।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ৯টি প্রধান আন্তর্জাতিক চুক্তির মধ্যে বলপূর্বক অন্তর্ধান বিষয়ক চুক্তি ছাড়া অন্যগুলি বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে। আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানবাধিকারের মূলনীতিগুলোকে বাংলাদেশ সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং নাগরিকের মানবাধিকারের সুরক্ষায় বিভিন্ন বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে’। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার শিরোনামে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারগুলোর সুরক্ষার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বিশ্রাম ও চিত্ত বিনোদন এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক মানবাধিকারগুলোকে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

www.bpsc.gov.bd

www.cagbd.org

www.lawjusticediv.gov.bd

লেখক

কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

